তমুদ্দন সিরিজ নং ১

মুস্‌লিম সভ্যতায় নারীর দান

এ, এফ্, এম্, আব্দুল জলীল, এম, এ, বি, এল

গুলিস্তান লাইব্রেরী
১৩-২, মোল্লাপাড়া বাই লেন
পোঃ শিবপুর (হাওড়া)

প্রকাশিকা :

বেগম রহিমা খানম

আল্‌হামরা লাইব্রেরী

১৮, মুসলমান পাড়া লেন,

কলিকাতা

মূল্য—পাঁচসিকা

প্রথম সংস্করণ

এপ্রিল, ১৯৪৬

ক্লাসিক প্রেস

২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীতেজেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

নিভৃত পল্লীর বুকে বসিয়া তৃষাতুরের তৃষা, বুভুক্ষুর ক্ষুধা,
শোকাতুরের সান্ত্বনা, দীন ও দুঃখীর দুঃখ দূর
করিতে যিনি প্রতিটী মূহূর্ত্ত অতিবাহিত
করিয়াছেন সেই শোক-তাপ-জর্জ্জরিতা ও
অসীমধৈর্য্যশীলা আমার স্নেহময়ী
নানীজানের খেদমতে আমার
এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি
উৎসর্গীকৃত
হইল।

"এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু্ গন্ধ সুনির্ম্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারী।
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারি বাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে, নারী যোগায়েছে মধু।

* * * * * *

নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্‌।
কোন্‌ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিন্দুর লেখা নাই তার পাশে।"

—নজরুল ইস্‌লাম

আরম্ভ

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালার অনুগ্রহে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। দুনিয়া যে সময় সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে লিপ্ত তখন ইহা লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালেও দেশে শান্তি আসিল না। বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় কিছু কিছু দোষ ত্রুটী রহিয়া গেল; আশা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ সেগুলি নিজেরাই সংশোধন করিয়া লইবেন।

গ্রন্থারম্ভেই ইস্‌লামের পূর্ব্বে নারীজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল এবং ইস্‌লাম নারীকে কোন্ স্তরে তুলিল সে বিষয় আলোচনা করিয়াছি। প্রাগ্ ইস্‌লামী যুগে যে নারী ছিল অজ্ঞাতা, অখ্যাতা, লাঞ্ছিতা এবং একমাত্র পুরুষের লালসা বহ্নির ইন্ধনের সামগ্রী— হজরত মোহাম্মদ (সঃ) তাহাকে করিলেন বেহেশ্‌ত তুল গরীয়সী, সর্ব্বগুণবিভূষিতা জননী!

সে যুগের আদর্শ মুস্‌লিম মহিলা ও তাঁহাদের গুণাবলী, আরবদেশ, স্পেন ও মুস্‌লিম ভারতে নারীদের অবাধ জ্ঞান-চর্চ্চা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে করা হইয়াছে। সে যুগের নারীরা বীরাঙ্গনা, রাজনীতিতে পারদর্শিনী, সুলেখিকা, কবি, বাগ্মী ও সুনিপুণা গৃহিণীরূপে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। আমাদের দেশের নারী সমাজ সত্যিকারের ইস্‌লামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতির উন্নতিকল্পে আত্ম-

নিয়োগ করিলে নিদ্রাতুর সমাজ যে সচেতন হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমার বহু বন্ধুবান্ধব আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমেই বন্ধুবর পীরজাদা এ, জেড্, এম্, রেজয়ানুল হক বি,এ'র নাম করিতে হয়। তিনি অশেষ পরিশ্রম সহকারে পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বন্ধুবর মৌলভী আবুল মনসুর, এম, এ এবং বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম্, এ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় মৌলভী কাজি আব্দুল ওদুদ, এম, এ, মৌলভী ওস্‌মান গণি, এম, এ, বি, ই, এস (Registrar of Publication, Bengal) এবং অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন সাহেব, এম, এ, আমাকে নানাভাবে উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া বিশেষ বাধিত করিয়াছেন।

থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং'এর মিঃ এন্ মুখার্জ্জী মহোদয়ের সাহায্য না পাইলে আমার পুস্তকখানি এত সত্বর প্রকাশিত হইতে পারিত না। তাঁহার নিকট আমি ঋণী রহিলাম।

বিনীত

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

মুস্‌লিম সভ্যতায় নারীর দান

প্রাক্‌-ইস্‌লামী যুগের নারী

নূর নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জন্ম এবং ইস্‌লামের অভ্যুদয় পৃথিবীর ইতিহাসের এক অতি স্মরণীয় ঘটনা। ইস্‌লামের পূর্ব্বে নারীজাতির অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। পৃথিবীময় অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচার তখন সদাচার বলিয়া সূচিত হইত। জাতিভেদ প্রথা, দাসত্ব প্রথা প্রভৃতি সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিয়া উহাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। ক্রীত দাসদাসীদের ন্যায় সাধারণ ঘরের নারীজাতির অবস্থাও ছিল অতীব শোচনীয়।

হজরত মোহাম্মদের জন্মের সময় আরবের রমণীগণের অবস্থা ছিল সকল দেশের নারীদের অপেক্ষাও হীন। সেদেশে নারীদের উপর যেরূপ অত্যাচার ও অবিচার চলিত তাহা সত্যই অভাবনীয়। প্রাচীন সভ্যতার আবাসভূমি—গ্রীস, রোম, সিরিয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশসমূহে নারীদের অবস্থাও একই রূপ ছিল।

মানব সভ্যতার অন্যতম বাসভূমি ভারতবর্ষের নারীর অবস্থাও তখন অতীব শোচনীয় ছিল। শাস্ত্রকারগণ নারীজাতির প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন তাহা শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা নারীদের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইতর-ভদ্র, মহৎ-ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র—সর্ব্বশ্রেণীর নারীর অবস্থা ছিল একই রূপ। ভারতে নারীর স্বত্ত্ব ও অধিকার বলিতে কিছুই ছিল না। নারী তখন পুরুষের কাম বাসনা চরিতার্থ করিবার সম্বল মাত্র ছিল। পুরুষেরা নারীকে সমাজের দুর্ব্বহ বিপদ বলিয়া ঘৃণা করিত। শূদ্রের ন্যায় সকল শ্রেণীর নারীর ভগবতবাণীর একটী বর্ণ উচ্চারণ—এমন কি শ্রবণ করার অধিকারও ছিল না। এইরূপ কোন মহাপাপে লিপ্ত হইলে তাহাকে হত্যা করা

হইত। নারী পিতার প্রিয়বৎসলা কন্যা, ভ্রাতার স্নেহময়ী ভগিনী, স্বামীর অতি সোহাগের সহধর্ম্মিণী এবং সন্তানের জননী। কিন্তু তবুও সমাজ জীবনের কোন স্তরে স্বাধিকারের হিসাবে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করার সামান্য একটু স্থানও তখন ভারতে ছিল না। ভারতের দায়ভাগ নারীকে একপ্রকার আমল না দিয়াই সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা দিয়াছে। বিবাহে তাহার মতামতের কোন মূল্য গ্রহণ করা হয় না। হিন্দু শাস্ত্রমতে আট প্রকার বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিলেই তখনকার নারীজাতির দুরবস্থার কথা সম্যক্ অবগত হওয়া যায়।

হিন্দু ধর্ম্মানুসারে মানবের আদি পিতা ভগবান মনু ; এবং মনু হইতেই সমগ্র মানব জাতি জন্মলাভ করিয়াছে—ইহাই শাস্ত্রকারদের মত। ভগবান মনু স্বয়ং নারী-জাতির প্রতি যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"নারীরা সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করে না, যুবা বা বৃদ্ধ তাহাও দেখে না, সুরূপ বা কুরূপ হউক, তাহারা পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ করে। কোন পুরুষকে দর্শন করা মাত্রই তাহার সহিত 'ক্রীড়া'য় রত হওয়ার

ইচ্ছা স্ত্রীলোকদের জন্মিয়া থাকে। এজন্য এবং চিত্তের স্থিরতার অভাবে স্বভাবতঃ স্নেহশূন্যতাপ্রযুক্ত, স্বামী কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেও স্ত্রীলোক স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারাদি কুক্রিয়ায় লিপ্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের এইরূপ স্বভাব স্বয়ং বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে।”

ভগবান মনুর ব্যবস্থায় অন্য আর একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়—

“মন্ত্রদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের জাতকর্ম্মাদির সংস্কার হয় না—এজন্য তাহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইতে পারে না—এবং যেহেতু বেদ স্মৃতিতে তাহাদের কোন অধিকার নাই এজন্য তাহারা ধর্ম্মজ্ঞও হইতে পারে না। এবং পাপ করিয়া কোন মন্ত্রের আবৃত্তির দ্বারা যে তাহারা পাপস্খালন করিয়া লইবে সে সুযোগও তাহাদের নাই, কারণ কোন প্রকার মন্ত্রে তাহাদের অধিকার নাই।”

এইত গেল মানব সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র ভারতীয় নারীর কথা। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের নারীর অবস্থাও ছিল অতীব শোচনীয়। পারস্যের জগৎ-বিখ্যাত সম্রাট নওশেরওয়ার পিতা কোবাদের সময় বিখ্যাত মজ্‌দকের অভ্যুত্থান ঘটে। বিদ্রোহী মজদক ঘোষণা করেন যে—“জন, জমিন ও জর”--

অর্থাৎ কামিনী, কাঞ্চন ও ভূমি লইয়াই যখন মানুষ বিবাদ বিসম্বাদ ও পাপে লিপ্ত হয় তখন—"কোন প্রকার বিচার বিবেচনা না করিয়া নিয়ম করিতে হইবে যে, স্ত্রীলোক মাত্রেই পুরুষ মাত্রের উপভোগ্যা। বিবাহের বন্ধন বা আত্মীয়তার বিধি নিষেধ, এমন কি নারীদের সম্মতি বা অসম্মতি এই শয়তানি ভোগবিলাসে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না।" সম্রাট কোবাদ মজ্‌দকের এই ঘৃণিত প্রস্তাব সমর্থন করেন। পারস্যবাসিগণ ইহার ফল ভালভাবেই ভোগ করিয়াছিল।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে খৃষ্টান জগতের অবস্থাও মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। নারী জাতি ও ক্রীতদাসদিগকে খৃষ্টানেরা গরু, ছাগলের ন্যায় মনে করিত। ধর্ম্মের নামে তাহারা অনাচার, অত্যাচার এবং অবাধ নরহত্যা করিত। মদ্যপান, জুয়া ও ব্যভিচার প্রভৃতি জঘন্য কার্য্যগুলিই ছিল খৃষ্টান জগতে সভ্যতার মাপকাঠি। নারীদের আত্মা আছে কিনা তাহা লইয়াও খৃষ্টানেরা মাথা ঘামাইত। এ বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে অনেক সময় তর্ক সভারও অনুষ্ঠান হইত। সুসভ্য রোম নারীজাতির প্রতি একটুও সুবিচার করে নাই। একমাত্র কাম বাসনা চরিতার্থ করার জন্যই নারীর জন্ম—

এই ছিল তাহাদের ধারণা। ইহুদী ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও নারীদের অবস্থা অনুরূপ ছিল।

প্রাক্‌-ইস্‌লামী যুগে আরব নারীর অবস্থা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। আরব দেশে নারীদিগকে গরু, ছাগলের ন্যায় প্রকাশ্য বাজারে দাসীরূপে ক্রয় বিক্রয় করা হইত। বালিকাদিগকে জোরপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারিলেই তাহারা বংশপরম্পরাক্রমে লুণ্ঠনকারীর দাস্যকার্য্যে লিপ্ত থাকিত। প্রভুদিগের খেয়াল ও পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য দাসীগণ তাহাদের সর্ব্বপ্রকার আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইত। প্রভুর ইচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে ছাগ-মেষের ন্যায় বলিদান ও বাজারে বিক্রয় করা হইত। পশু অপেক্ষাও তাহাদিগকে অধিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত। কদর্য্য খাদ্য ও পোষাক এবং কদর্য্য বাসস্থানে তাহাদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে থাকিতে হইত। হাবসী ক্রীতদাসীদিগের উপরও খুব অত্যাচার চলিত। এ ছাড়া সুন্দরী দাসীরা প্রভুর কামাগ্নির ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইত। এইত গেল আরবের ক্রীতদাসীদের অবস্থা। সাধারণ ঘরের নারীদের অবস্থা ইহার চেয়েও অধিক শোচনীয় ছিল।

আরব সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল নিম্নতম

স্তরে। তৎকালীন প্রেমের কবিতায় কাম বাসনারই বীভৎসরূপ আমাদের চোখে সর্ব্বাগ্রে ধরা পড়ে। নারী ছিল আরবদের নিকট একমাত্র ভোগের সামগ্রী। তাহার কার্য্যই ছিল পুরুষের কামবাসনা চরিতার্থ করা। নিম্নশ্রেণীর পশুব ন্যায় তাহারা ব্যবহার পাইত।

আরবদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। স্ত্রী গ্রহণের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। নিজের ইচ্ছামত একজন যত খুসী স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত। উপরন্তু অসংখ্য প্রেমিকাকে সম্ভোগ করিতে তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বেশ্যাবৃত্তি ব্যবসায় হিসাবে ধূমধামের সহিত চলিত। বন্দী স্ত্রীলোকেরা প্রভুর কামবাসনা পূরণ ছাড়াও তাহার আদেশ অনুসারে ঐ জঘন্য ব্যবসায়ের দ্বারা প্রভুকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দিতে বাধ্য হইত। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামীর ইচ্ছানুসারে সন্তান সন্ততির জন্য অন্যের সহিত সহবাস করিত। উহা 'ইস্তিবজা' নামে পরিচিত ছিল। এখনও হিন্দু সমাজে 'নিয়োগ' বলিয়া যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা ঐ ইস্তিবজারই আর এক পিঠ। পিতা, স্বামী অথবা স্ব-জন পরিত্যক্ত কোন সম্পত্তিতে নারীব একবিন্দুও অধিকার ছিল না। বরং মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির

অন্যতম অঙ্গ হিসাবেই তাহাদিগকে গণ্য করা হইত। সম্পত্তির সহিত নারীকেও ভাগ বাটোয়ারা করা হইত। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি, অন্যান্য তৈজষপত্র ও পশু-পালেব সহিত পুত্রগণ তাহার স্ত্রী কন্যাদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইত এবং অবাধে ভোগ দখল করিত। ঐ ব্যক্তি তাহাদিগকে যেমন ইচ্ছা সেইভাবে ব্যবহার করিতে পারিত। সে নিজে তাহাদিগকে বিবাহ বা আশ্রিতা করিয়া রাখিত, না হয় অন্য কাহারও সহিত খুসীমত বিবাহ দিত। গর্ভধারিণী জননী ব্যতীত অপর কোন নারী—এমন কি সহোদরা ভগ্নী ও বিমাতা পর্য্যন্ত তাহার অগম্য ছিল না।

আরব দেশে পবিত্র বিবাহ বন্ধনের কোন বিধি নিষেধ ছিল না। বিবাহ বিচ্ছেদ যেমন অবাধ তেমনই বর্ব্বরতা-পূর্ণ ছিল। এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বহুবার তালাক দিতে ও "ইদ্দতের" মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিত। কখন সে প্রতিজ্ঞা করিত যে স্ত্রীকে সে মা বলিয়া গ্রহণ করিল—কখন আবার বলিত যে তাহার নিকট সে আর গমন করিবে না। এইভাবে তাহাকে না তালাক এবং না গ্রহণের মধ্যে ফেলিয়া ভয়ানক কষ্ট দিত। স্ত্রীর উপর রুষ্ট হইলেই স্বামী এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন

করিত। এইরূপ দুঃসহ জীবন যাপন করা ছাড়া অবলা নারীর আর কোন গতিই ছিল না।

তরুণীদের সহিত প্রেম ও ভালবাসা এবং সহবাসের কথা কবিতা ও গল্পে অতি জঘন্য ভাষায় রচিত হইত। মেয়েদের আত্মসম্মানকে একেবারে পদদলিত করিয়া ঐ সমস্ত কবিতা অসঙ্কোচে গর্ব্বের সহিত সাধারণের সমক্ষে পঠিত হইত। উচ্চ বংশের নারীদিগকে লইয়া রচিত প্রেমমূলক কবিতা প্রকাশ্য স্থানে পঠিত হইত।

এই সমস্ত ব্যাপারের জন্যই তখন আরব দেশে কন্যাদিগকে জীবন্ত দগ্ধ অথবা জীবন্ত প্রোথিত করা হইত। কারণ ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বারা নিজ গোত্রের সম্মানের হানি হয়—এই ভয়ে পিতা দায় হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিত। কন্যার জন্মের কথা শুনিবামাত্র পিতার মুখ দুঃখ ও হতাশায় অন্ধকার হইয়া পড়িত। হয় পিতা তাহাকে হত্যা করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিত, না হয় তাহাকে কদর্য্যতার মধ্যে বাঁচিতে হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যাকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দূর হইতে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তিলে তিলে নিহত করা হইত। আবার কোন কোন সময়ে একেবারে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। একবার হজরত এইরূপ একটী

ঘটনার সংবাদ শ্রবণে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। অনেক সময় বিবাহ সভায় এইরূপ সর্ত্ত লিখিত হইত যে উক্ত দম্পতির কন্যা সন্তান জন্মিলে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে ঐ নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর কার্য্য মাতাকে পরিবারের নিমন্ত্রিত সমস্ত মেয়েদেব উপস্থিতিতে সম্পন্ন করিতে হইত অনেক ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণের অজুহাতেও মেয়েদের জন্মের সময় মারিয়া ফেলা হইত।

হজরত মোহাম্মদের পূর্ব্বে নারী জাতির অবস্থা জগতে কিরূপ ছিল সে বিষয় আমরা অতি সঙ্ক্ষেপে আলোচনা করিলাম। ইস্‌লাম নারী জাতিকে কোন্ স্তরে তুলিল তাহাই আমাদের পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়।

ইস্‌লামে স্ত্রী-স্বাধীনতা

প্রাক্-ইস্‌লামী যুগে নারী জাতির অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে সে যুগের সমাজ নারীকে সাধারণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় মনে করিত। পৈতৃক বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার আইনে স্বীকৃত হইত না। নারীদের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইত না। তাহাদিগকে দাসদাসীর পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইত। সমাজে পবিত্র বিবাহ বন্ধনের কোন সুশৃঙ্খল নিয়ম ছিল না। একমাত্র পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই নারীকে বিবাহ করা হইত। নারী —"the gate of devil, the road to inequity, the poison of the asp"—বলিয়া সমাজে বিশেষ অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের পাত্রী ছিল। সুসভ্য রোম, প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল চীন, ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, পারস্য

প্রভৃতি সমস্ত দেশেই নারীর অবস্থা প্রায় একই প্রকার ছিল।

বহু অমুসলমান লেখক অজ্ঞতা বশতঃ বলিয়াছেন—"ইস্‌লামে স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই নাই"। তাহাদের মতে ইস্‌লামে নারীকে পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দেওয়া হয় নাই এবং অন্যান্য সমাজের তুলনায় মুস্‌লিম নারীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত হীন। কিন্তু ইস্‌লামের নীতি যে কত মহৎ এবং নারীজাতির স্থান এখানে যে কত উচ্চে তাহা আমরা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পণ্ডিত এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ সাহেব বলেন—"ইস্‌লাম যে সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বর্ব্বরতা ও সামাজিক অত্যাচার হইতে মুক্ত।" এখানে স্ত্রী পুরুষের সম অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। নারীরা পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ বিগ্রহে যোগদান এবং সমস্ত প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্যে যোগদান করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। তাহাদের এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা পুরুষের নাই।

হজরত মোহাম্মদ সমগ্র নারীজাতির যে অশেষ কল্যান সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা আর

কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। পশুরও নিম্নতম স্থান হইতে তিনি নারীকে পুরুষের সমপর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া পুরুষের ন্যায় পূর্ণ সম্মান দান করিয়াছেন। ইউরোপে সামান্য একটু স্ত্রী-স্বাধীনতা দিয়া তাহারা নিজেদের শতমুখে প্রশংসা করে, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা নামে কথিত হইবার যোগ্যই নহে। উহা স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতার সহিত তথাকথিত ইউরোপের নারী স্বাধীনতার কোন সামঞ্জস্য নাই। হজরত মোহাম্মদ নারীকে তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়া তাহাকে গৌরবান্বিতা করিয়াছেন। তিনি তাহার ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া পুরুষের নিষ্পেষন হইতে নারীকে সযত্নে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। নারীর আসল সম্মান ও মর্য্যাদা তাহার সতীত্ব রক্ষায়। এজন্য হজরত যে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাও অতুলনীয়। হিন্দু শাস্ত্রকারদের সমাজ ব্যবস্থা যেন উহার সহিত আলো আর অন্ধকারের সম্বন্ধের ন্যায়।

মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোর্-আন্ এবং হাদীসে নারী জাতির অবস্থার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। মহাগ্রন্থ কোর্-আন্ এবং হাদীস হইতে কতিপয় অমূল্য বাণী আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"যিনি আদম হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি হাওয়াকেও একই উপাদান হইতে সৃজন করিয়াছেন।"

—কোর্-আন্।

মানব-জননী বিবি হাওয়া আদমের পার্শ্বদেশ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। পুরুষ ও নারী যে একই উপাদান হইতে সৃষ্টি লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের জ্ঞান, বিবেক, আত্মা সবই আছে,—একথা কোর্-আন্ স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম্মে এইরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না।

"নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপরও নারীর ঠিক তেমনই সম-অধিকার আছে।"

—কোর্-আন্।

"পুরুষ নিজে যাহা আয় উপার্জ্জন করিবে, তাহাতে তাহার যেমন নিজের অধিকার আছে, তেমনই নারী যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহাতে তাহার (নারীর) ও অধিকার সেইরূপ।"

—কোর্-আন্।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম ব্যবস্থায় নারী, পিতা বা স্বামীর সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাইবার অধিকারিণী। এইরূপ সম-অধিকার অন্য কোন ধর্ম্মে স্বীকৃত হয় নাই। স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। বিবাহের সময় স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে সম্মানের চিহ্নস্বরূপ একটী নির্দ্ধারিত দেন মোহর পাইয়া থাকেন। এই দেন মোহর দান প্রথা নারী জাতির পক্ষে একটী বড় সম্মান। ধর্ম্মকার্য্য করিতে নারীকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

"নিশ্চয়ই মুসলমান স্ত্রী এবং পুরুষ যে কেহ সৎকাজ করিবে এবং বিশ্বাস স্থাপন করিবে, স্ত্রী হউক আর পুরুষ হউক তাহারা সকলেই আল্লার নিকট হইতে মহা-পুরস্কার (বেহেশ্‌ত) লাভ করিবে।"

—কোর্‌-আন্‌।

"স্ত্রী স্বামীর ভূষণ এবং স্বামীও স্ত্রীর ভূষণ স্বরূপ।"

—কোর্‌-আন্‌।

স্ত্রীলোকদের প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য হজরত যে সমস্ত নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহার কয়েকটী এখানে উল্লেখ করা গেল—

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে তাহার স্ত্রীর প্রতি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে।"

—হাদীস।

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে ঘৃণা করিবে না। যদি তোমরা তাহাদের কোন একটী দোষের জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া থাক তবে অন্য একটী গুণের জন্য তাহাদের উপর সুখী থাকিবে।"

—হাদীস।

অবশ্য কোর্‌-আন্‌ ও হাদীস নারীজাতিকে যে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছে তাহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। মানুষের স্বাধীনতা সব সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ। স্বাধীন দেশের মানুষেরও রাষ্ট্রের আইন কানুন মান্য করিয়া চলিতে হয়। সুশৃঙ্খলিত স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। আধুনিক যুগের নারীজাতির স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা যাহা বুঝি তাহা ইস্‌লামের স্বাধীনতা নহে। এইরূপ স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইস্‌লামে নারীকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে তাহাও পুরুষের ন্যায় সীমাবদ্ধ এবং সুশৃঙ্খলতাপূর্ণ। দাম্পত্য জীবনে নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য বর্ত্তমান। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাও মনে না করা হয় যেন নারী অবজ্ঞার পাত্রী এবং অনুগ্রহের প্রার্থী। নারী পুরুষের নিকট হইতে স্নেহ-মমতা, প্রীতি ও প্রেম লাভ করিবার

সম্পূর্ণ অধিকারিণী। আল্লাহ্‌ নারীকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষও নারীকে আপন তত্ত্বাবধানে আশ্রয় দিয়াছে।

নারীর উপর পুরুষের যেরূপ প্রাধান্য আছে, তাহা তাহার অমঙ্গলের জন্য নহে। পুরুষ ও নারীর পরস্পর সম্বন্ধ অতি গভীর। জ্ঞানার্জ্জনে নারী পুরুষের সমান অধিকারিণী। হজরত বলিয়াছেন :

"প্রত্যেক নরনারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ।" নারী পুরুষের জননী, ভগিনী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী। সে বিপদে বন্ধু, সম্পদে সুখ ও গৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

মস্‌জিদে গিয়া প্রার্থনা করিতে নারী পুরুষের ন্যায় সম-অধিকার প্রাপ্তা। হজরত বলিয়াছেন :

"পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ধার্ম্মিকা স্ত্রীই শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। আল্লা'র নিকট এবং জগতের নিকট সে-ই নির্দ্দোষ যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নিকট নির্দ্দোষ।"

ইস্‌লাম ধর্ম্মমতে স্বীয় স্ত্রীপুত্রদিগকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া অন্যত্র গমন মহাপাপ।

"যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রদিগকে যথোচিত ভরণপোষণ দিয়া শান্তি দান করে, ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা তাহার কার্য্য অধিকতর প্রশংসনীয়।" —হাদীস।

ইস্‌লাম বহু-বিবাহের সৃষ্টি করে নাই। ইহা বহু-বিবাহ প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। পবিত্র কোর্‌-আন্ শরীফে আছে :

"তোমার পছন্দমত স্ত্রী গ্রহণ কর—দুই, তিন বা চারিজন। কিন্তু যদি তুমি তাহাদিগকে ন্যায়পরায়ণতার সহিত সমভাবে দেখিতে না পার, এইরূপ ভয় (বা সন্দেহ) থাকে তবে মাত্র একটী স্ত্রী গ্রহণ করিও।"

প্রাক্-ইস্‌লামী যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহে পুরাতন জাতিগুলির মধ্যে বহু-বিবাহের প্রচলন ছিল। মূর্ত্তিপূজক আরববাসীরা যখন ইচ্ছা যাহাকে বিবাহ করিত। বিবাহের তখন কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। হজরত এই বহু-বিবাহ প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে সুন্দর ব্যবস্থা দিলেন তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত।

উপরে বর্ণিত কোর্‌-আন্ ও হাদীসগুলির মধ্যে আমরা খুবই যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা দেখিতে পাই। কোন ব্যক্তি যদি একের অধিক নারী বিবাহ করিয়া সুখী হইতে চায় তবে আল্লা'র বিধান অনুযায়ী তাহাকে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে হইবে। একমাত্র যাহারা এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবে

তাহারাই একের অধিক এবং চারিটী পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিবে। কোন কোন সময়ে এমন অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে যে কাহারও পক্ষে একের অধিক বিবাহ করা আবশ্যকীয় হইয়া পড়ে। কোর্‌-আনের এই আদেশ দ্বারা তদানীন্তন যুগের উচ্ছৃঙ্খল বিবাহ প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে।

ইস্‌লামে বিবাহ-প্রথা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পর একটী চুক্তি বিশেষ। একজন বয়স্ক স্ত্রীলোক তাহার পছন্দমত স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়সে যদি কাহারও বিবাহ হইয়া থাকে তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই নারী বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারিবে। নারীদের বিনা সম্মতিতে ইস্‌লাম কোনপ্রকার বিবাহ অনুমোদন করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদিগকেও তালাক দেওয়ার ক্ষমতা ইস্‌লামে স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র পৃথিবী যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন হজরত মোহাম্মদ নারীজাতির প্রতি যে সুবিচার করিয়া গিয়াছেন, অধুনা সভ্য জগৎও সেই সমস্ত বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতেছে। চির-লাঞ্ছিতা ও ঘৃণিতা নারীজাতিকে হজরত মহিমময়ী, চিরকল্যাণী ও গরীয়সী করিয়া তুলিয়াছেন। ইস্‌লাম ও

উহার প্রবর্ত্তক নারীকে যাহা দান করিলেন তাহা চিরকালের জন্যই দিয়া গেলেন। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর কোনরূপ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা থাকিল না।

হজরত মানব-শিশুকে এই মহাবাণী শুনাইলেন,—"বৎস, তোমার বেহেশ্‌ত জননীর পদতলে।" সুতরাং ইস্‌লাম রমণীকে এমন এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, যে স্থান বেহেশ্‌ত অপেক্ষাও অনেক উন্নত স্তরে। এমন একদিন ছিল যেদিন উদ্ধত পুরুষ নারীকে লাঞ্ছিতা ও পদদলিতা করিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম সাধন করিয়া জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করিতেছিল। আল্লা'র রসুল নূরনবী মোহাম্মদ ভ্রান্ত পুরুষের সেই মোহান্ধকার দূর করিয়া অমর জ্যোতিঃতে দেখাইলেন নারীর স্থান কোথায়! যে রমণী সন্তানের জননী—হৃদয়ের সুধারস, বক্ষের পিঞ্জর, স্নেহের উত্তাপ দান করিয়া সন্তানকে পান করাইতেছেন,—যিনি সন্তানের দেহে দিয়াছেন শক্তি, মুখে দিয়াছেন মন-ভুলানো ভাষা, অধরে দিয়াছেন হৃদয়-জুড়ানো হাসি, তাহার স্থান যে কত উচ্চে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে রমণী স্নেহময়ী ভগিনীরূপে ভ্রাতার পার্শ্বে বিরাজমানা, যিনি হৃদয়ের প্রেম-পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া সম্পদে বিপদে দরদী বান্ধবীরূ-

ন্যায় স্বামী-পার্শ্বে সমাসীনা,—আদরে সোহাগে, লালনে পালনে যাঁহার প্রেম-নির্ঝরিণী কর্ম্মক্লান্ত পুরুষের তৃষাদীর্ণ হৃদয়মরুতে শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়,—যাঁহার অক্লান্ত সেবা প্রতিদানের কোন আশা না রাখিয়া আদরে আপ্যায়নে সংসারে বেহেশ্‌তের শোভা ফুটাইয়া তোলে,—তাহাকে অবমাননা করায় আমরা হীনতার কোন্ গভীর গহ্বরে যে অবতরণ করি তাহা সহজেই অনুমেয়।

পুরুষ ও নারী—এই দুই মিলিয়াই সংসার। অব্যক্ত প্রকৃতির রহস্যময়ী সৃষ্টির অন্তরালে এই দুইয়েরই লীলা। একের অভাবে অপর প্রকাশহীন। এই দুইয়ের সুষ্ঠু মিলন আনে রস, আনে গন্ধ, আনে প্রাণ, আনে বায়ু, আনে পূর্ণ-মিলনের প্রাণ-প্রাচুর্য্য—আর বসন্ত সন্ধ্যার প্রেম-মদিরা। নূরনবী হজরত মোহাম্মদ এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া নারীকে দিলেন তাহার শ্রেষ্ঠ আসন। হজরত প্রবর্ত্তিত ইস্‌লামের পূর্ব্বে যে নারী ছিল অজ্ঞাতা, অখ্যাতা, লাঞ্ছিতা এবং পুরুষের লালসা-বহ্নির ইন্ধনের সামগ্রী,—হজরত তাহাকে করিলেন বেহেশ্‌ততুল্য, গরীয়সী, সর্ব্বগুণ-বিভূষিতা জননী।

সে যুগের আদর্শ নারী

ইস্‌লাম ধর্ম্মের পূতমন্ত্র যখন আরব ও অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করিল তখন পুরুষের পার্শ্বে নারীরাও আসিয়া সমপর্য্যায়ে দণ্ডায়মান হইল। যুদ্ধবিগ্রহ, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ব্যাপারে নারীরাও অংশ গ্রহণ করিয়া ইস্‌লাম, তথা মানবজাতির, গৌরব বর্দ্ধন করিল। ইস্‌লামের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সে যুগে যে সমস্ত মহিলা বরণীয়া হইয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে দুই চারিজনের বিষয় এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

হজরত খাদিজা

হজরত খাদিজা আরবের জনৈক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন প্রতিপত্তিশালী বণিক। পিতার মৃত্যুর পর খাদিজা পিতার এবং মৃত স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইলেন। হজরতের সততা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হইয়া খাদিজা তাঁহাকে আপন ব্যবসায় পর্য্যবেক্ষণ করিবার কার্য্যে

নিযুক্ত করেন। হজরতের গুণপনা ও কার্য্যদক্ষতায় খাদিজা অধিকতর মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর পঁচিশ বৎসর বয়সে হজরত এই মহিলাকে বিবাহ করেন। খাদিজার বয়স তখন চল্লিশ বৎসর। ইনিই হজরতের সর্ব্বপ্রথমা এবং প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সংসার জীবনে কোন প্রকার অশান্তি বা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় নাই।

খাদিজা আদর্শ রমণী ছিলেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহ ছিল। যত্নের সহিত তিনি নিজ সন্তানসন্ততিদিগকে লালনপালন করিতেন। তাঁহার পতি-ভক্তি ছিল অচল এবং অটল।

নূরনবী যখন হেরা পর্ব্বতের গিরিগুহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নিকট যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল বর্ণনা করিলেন, তখন এই মহীয়সী মহিলা দ্বিধাবোধ না করিয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনিই হজরতকে সর্ব্বপ্রথম আল্লা'র প্রেরিত নবী বলিয়া বিশ্বাস করেন। খাদিজাই সর্ব্বপ্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার গৌরবে গৌরবান্বিতা।

খাদিজা পরম ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। তাঁহার জীবন যাপন প্রণালী অত্যন্ত সাদাসিদে ভাবে নির্ব্বাহ

হইত। তাঁহার দেহের গঠন এবং গাত্রবর্ণ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। জ্ঞানী ও গুণীর মর্য্যাদা দিতে তিনি জানিতেন। বিদ্বান ব্যক্তিরা তাহার কাছে বিশেষ সমাদর পাইতেন।

মুস্‌লিম জাহানে খাদিজার দান চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার বিপুল ধনসম্ভার তিনি ইস্‌লামের খেদমতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার সাহায্য না পাইলে হজরতের মহান্‌ কার্য্যে আরও বহু অসুবিধা ঘটিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পরের দুঃখ ও দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য খাদিজা মুক্তহস্ত ছিলেন। অগাধ ধনসম্ভারের অধিকারিণী হইয়াও তিনি বহুপ্রকার বিপদ আপদ অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন। সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় তিনি কোনপ্রকার অভিযোগ করিতে জানিতেন না।

খাদিজার মৃত্যুর পর হজরত প্রায়ই তাঁহার কথা আলোচনা করিতেন। একদিন বিবি আয়েশা হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কেন বৃদ্ধা রমণীর কথা প্রায়ই আলোচনা করেন? আল্লাহ্‌ আপনাকে তদপেক্ষা বহু সুন্দরী রমণী দান করিয়াছেন।" তদুত্তরে হজরত বলিলেন—"না, তাহা হইতে পারে না। খাদিজা

আমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত এবং সে-ই সর্ব্বপ্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্মে বিশ্বাস আনয়ন করিয়াছিল। আমি সত্যই তাহাকে ভালবাসিতাম।"

খাদিজার মহান্ চরিত্র ও সদ্‌গুণ-রাজির জন্যই হজরত সর্ব্বদা তাঁহার কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন। তাঁহার গুণগরিমা এবং মহান্ আদর্শের কথা চিরকাল মুস্‌লিম জগৎ সসম্ভ্রমে স্মরণ করিবে।

হজরত আয়েশা

হজরত আয়েশা মুস্‌লিম জগতের প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের দুহিতা এবং মহানবী মোহাম্মদের সহধর্ম্মিণী। বাহান্ন বৎসর বয়সে হজরত তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রতি হজরতের প্রেম ও ভালবাসা ছিল অতীব গভীর। আয়েশা ক্ষীণাঙ্গী রমণী ছিলেন। তিনি হজরতের অন্যান্য সহধর্ম্মিণিগণ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী ছিলেন।

আয়েশা কায়িক পরিশ্রমকে বিশেষ পছন্দ করিতেন। স্বীয় হস্তে সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ পাইতেন। অবসর সময়ে তিনি হজরতকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার সরল জীবন

যাপন, নম্র ব্যবহার, আতিথেয়তা ও উদারতা আদর্শ-স্থানীয় ছিল। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না। তিনি মুক্তহস্তে এতিম ও দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। নিজের ভবিষ্যতের জন্য তিনি এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। একদা ওমাইয়া গোত্রের অধিনায়ক মাবিয়া তাঁহার নিকট এক লক্ষ দিরহাম প্রেরণ করিলে তিনি উহার সমস্তই দরিদ্র ও এতিমদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

পরোপকার সম্বন্ধে আয়েশার সুনাম ইস্‌লামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে। পরের উপকার করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটা পারিবারিক ঘটনার মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার মহান চরিত্রের আদর্শ বর্ণনা করিব।

এক দিন আয়েশা রোজা ছিলেন। গৃহে একটা মাত্র রুটি ছাড়া আর কোনও খাদ্য সামগ্রী সেদিন ছিল না। একজন ভিক্ষুক দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তিনি রুটিখানা ভিক্ষুককে দিয়া দিতে দাসীকে আদেশ করিলেন। দাসী বলিল যে ঐ রুটি দিয়া দিলে ঘরে আর কোনই খাদ্যদ্রব্য থাকিবে না। তদুত্তরে আয়েশা বলিলেন—"আমাদের খাবারের জন্য আল্লা'হ যত্ন নিবেন।" সন্ধ্যার

সময় এক্‌টী লোক একখানি উত্তম রুটি উপঢৌকন পাঠাইলেন। আয়েশা দাসীকে বলিলেন—"এই লও তোমার রুটির উত্তম প্রতিদান।"

আয়েশা দান করিবার সময় হজরতের মহান্ আদর্শ ও উপদেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি কখনও দরিদ্রদিগকে শূন্য হস্তে ফিরাইয়া দিতেন না। সামান্য এক টুকরা খেজুরের অংশও তিনি দান করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। দীন দুঃখীরাও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং তাহাদের রক্ষক মনে করিত।

নিম্নের ঘটনাটী হজরত আয়েশা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"খাদ্য প্রস্তুতের জন্য আমি এক মাস ধরিয়া কোন আলো জ্বালিতে পারি নাই। খেজুর ও পানি খাইয়াই আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হইত। অন্য কাহারও নিকট হইতে মাংস না আসিলে আমাদের খাওয়া হইত না। হজরতের পরিবারবর্গের কেহই দুইদিন যাবৎ এক টুকরা রুটিও খাইতে পায় নাই।"

হজরতের মৃত্যুর পর আয়েশা দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের নিকট হইতে স্বীয় সংসার খরচের জন্য বার হাজার স্বর্ণ দিনার পাইতেন। এই অর্থের

যাপন, নম্র ব্যবহার, আতিথেয়তা ও উদারতা আদর্শ-স্থানীয় ছিল। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না। তিনি মুক্তহস্তে এতিম ও দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। নিজের ভবিষ্যতের জন্য তিনি এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। একদা ওমাইয়া গোত্রের অধিনায়ক মাবিয়া তাঁহার নিকট এক লক্ষ দিরহাম প্রেরণ করিলে তিনি উহার সমস্তই দরিদ্র ও এতিমদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

পরোপকার সম্বন্ধে আয়েশার সুনাম ইস্‌লামের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে। পরের উপকার করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটা পারিবারিক ঘটনার মধ্য দিয়া আমরা তাঁহার মহান চরিত্রের আদর্শ বর্ণনা করিব।

এক দিন আয়েশা রোজা ছিলেন। গৃহে একটা মাত্র রুটি ছাড়া আর কোনও খাদ্য সামগ্রী সেদিন ছিল না। একজন ভিক্ষুক দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তিনি রুটিখানা ভিক্ষুককে দিয়া দিতে দাসীকে আদেশ করিলেন। দাসী বলিল যে ঐ রুটি দিয়া দিলে ঘরে আর কোনই খাদ্যদ্রব্য থাকিবে না। তদুত্তরে আয়েশা বলিলেন—"আমাদের খাবারের জন্য আল্লা'হ যত্ন নিবেন।" সন্ধ্যার

সময় এক্টী লোক একখানি উত্তম রুটি উপঢৌকন পাঠাইলেন। আয়েশা দাসীকে বলিলেন—"এই লও তোমার রুটির উত্তম প্রতিদান।"

আয়েশা দান করিবার সময় হজরতের মহান্ আদর্শ ও উপদেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি কখনও দরিদ্রদিগকে শূন্য হস্তে ফিরাইয়া দিতেন না। সামান্য এক টুকরা খেজুরের অংশও তিনি দান করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। দীন দুঃখীরাও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং তাহাদের রক্ষক মনে করিত।

নিম্নের ঘটনাটী হজরত আয়েশা বর্ণনা করিয়াছেন:

"খাদ্য প্রস্তুতের জন্য আমি এক মাস ধরিয়া কোন আলো জ্বালিতে পারি নাই। খেজুর ও পানি খাইয়াই আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হইত। অন্য কাহারও নিকট হইতে মাংস না আসিলে আমাদের খাওয়া হইত না। হজরতের পরিবারবর্গের কেহই দুইদিন যাবৎ এক টুকরা রুটিও খাইতে পায় নাই।"

হজরতের মৃত্যুর পর আয়েশা দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের নিকট হইতে স্বীয় সংসার খরচের জন্য বার হাজার স্বর্ণ দিনার পাইতেন। এই অর্থের

প্রায় সমস্তই তিনি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন।

আয়েশা অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সহিহ্‌ হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই হাজারেরও উপর। হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। কোন জটিল সমস্যার উদ্ভব হইলে কোন কোন সাহাবা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উহার সমাধান করিয়া লইতেন। রাজ্যশাসন ও অন্যান্য ব্যাপারের পরামর্শ লইবার জন্য কেহ উপস্থিত হইলে আয়েশা তাহা সুন্দরভাবে মীমাংসা করিয়া দিতেন।

আয়েশা ধার্ম্মিকা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের আদেশ সমূহ তিনি বিশেষ ভক্তির সহিত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন।

আয়েশার মধ্যে বহু মনোমুগ্ধকর গুণ বিরাজ করিত। তিনি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। বক্তা হিসাবে তিনি ইস্‌লাম জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে একদা ওমাইয়া খলিফা মাবিয়া বলিয়াছিলেন,—"আয়েশা অপেক্ষা অন্য কোন তেজস্বী বক্তার বক্তৃতা আমি আর কোনদিন শ্রবণ করি নাই।"

হজরত আলীর সহিত তালহা ও জুবায়েরের যুদ্ধ বাঁধিলে আয়েশা হজরত ওসমানের হত্যার প্রতিবাদকল্পে উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করিয়া এই যুদ্ধে যোগদান করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ জামালের যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধক্ষেত্রের সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া আয়েশা যে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

"আরবের জনসাধারণ আমাকে ওসমান ও তাঁহার কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দোষী সাব্যস্ত করিতে চায়। আমাদের সহিত খোলাখুলি আলোচনা করিবার জন্য তাহারা মদিনায় আসিতে পারে। আমরা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা তাহারা অবগত আছে। ওসমানের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ তদন্তের ফলে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচারিগণ বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তাহারা অন্তরে এক প্রকার চিন্তা করে আর মুখে অন্যরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। বে-আইনী ভাবে তাহারা ওসমানের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অমানুষিকভাবে হত্যা করিয়াছে। অন্যায়ভাবে তাহারা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে।

তাহারা পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করিয়াছে। তাই আমি আমাদের বন্ধুবর্গকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে কেহ যেন অবহেলা না করেন। ওসমানের হত্যাকারীদিগকে শাস্তি দিতেই হইবে এবং আল্লা'র বিধানকে জয়যুক্ত করিতে হইবে।"

এই বক্তৃতা হইতে আয়েশার তেজস্বীতা ও ন্যায়-পরায়ণতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ-কল্পে জামালের যুদ্ধে যোগদান করিয়া বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই যুদ্ধে যোগদানের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া। যুদ্ধে সেনাপতিরূপে তিনি যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা ইস্‌লামের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

আরবী পুরাণে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ন্যায় বিচার ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ব্যবস্থাতত্ত্ববিদ্ হিসাবেও তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল।

আয়েশা দীনদুনিয়ার সর্ব্ববিধ জ্ঞানে বিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার আত্মসম্মান বোধ খুব বেশী ছিল।

ন্যায় বিচার করিতে তিনি কাহারও কোন প্রকার সোপারেশ বা খাতির রক্ষা করিতেন না। ইস্‌লাম জগৎ এই বিদুষী ও শ্রদ্ধাস্পদ "উম্মুল মুমেণীনের"—কথা চিরকাল ভক্তির সহিত স্মরণ করিবে। তেষট্টী বৎসর বয়সে তিনি জান্নাতবাসী হন এবং জান্নাত-উল-বাকীতে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

হজরত উম্মে সালমা

উম্মে সালমার বয়স যখন ছাব্বিস বৎসর তখন হজরত মোহাম্মদের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবি সালমা পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার কোমল ব্যবহারে ছোট বড় সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার পবিত্র হৃদয় ভগবৎ-প্রেমে ভরপুর ছিল। তিনি প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিন করিয়া রোজা রাখিতেন।

হাদীস সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি প্রায় চারিশত হাদীস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য চর্চ্চার দিকে আয়েশার ন্যায় উম্মে সালমারও বিশেষ ঝোঁক্ ছিল। তিনি সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোর্-আন্ পাঠ করিতেন। সকলেই তাঁহার কোর্-আন্ পাঠ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। নানাবিধ সমস্যা সমাধানে তিনি

বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। সাহাবাদিগকে অনেক সময় তিনি কোন কোন জটিল প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেন।

হজরত উম্মে সালমা স্নেহময়ী জননী এবং আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। হজরতকে তিনি মনেপ্রাণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। সন্তানদিগকে তিনি বিশেষ আদর ও যত্ন করিতেন। চৌরাশি বৎসর বয়সে তিনি এন্তেকাল করেন। জান্নাত-উল-বাকীতে, হজরত আয়েশার গোরস্থানের সন্নিকটে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

হজরত সুফিয়া

সুফিয়া আব্দুল গাই নামক জনৈক ইহুদীর কন্যা। প্রথমে জনৈক আরব কবির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সুফিয়া এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন যে বেহেশ্‌ত হইতে চাঁদ আসিয়া তাঁহার কোলে লুটোপুটি খাইতেছে। এই স্বপ্নের বিবরণ স্বামীর নিকট প্রকাশ করিলে তিনি উহার ব্যাখ্যা করেন যে সুফিয়া আরব-নবীর সহধর্ম্মিণী হইবেন। পর পর দুইজন স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং সুফিয়াও বন্দী অবস্থায় মুস্‌লিম শিবিরে নীত হন।

সুফিয়া যখন বন্দী অবস্থায় মুস্‌লিম শিবিরে কালাতিপাত করিতেছিলেন তখন তাঁহার হজরতকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়। হজরত অতঃপর এই বিধবাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে সুখী করেন। সুফিয়াও পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন।

সুফিয়া স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য্য ও প্রতিভাগুণে হজরতের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠেন। মুস্‌লিম ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সদয় ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এতিম ও দরিদ্রদিগকে তিনি সর্ব্বদা স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

হজরত ওসমানের খেলাফত শেষ হইবার সময় যখন বিদ্রোহীরা তাঁহার গৃহ অবরোধ করে তখন এই মহিলা অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। দুর্ব্বৃত্তগণ বাহিরের সমস্ত প্রকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলে তিনি নির্ভয়ে হজরত ওসমানকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। খচ্চরের পৃষ্ঠে চড়িয়া তিনি খলিফার গৃহে উপস্থিত হইয়া বিপদকালে তাঁহার অশেষ সাহায্য করেন। একদিন এক দুর্ব্বৃত্ত তাঁহার খচ্চরকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বীরদর্পে তাহাকে বলিলেন,—"উহাকে ছাড়িয়া দাও, অন্যথায় আমি এহেন অপমান কিছুতেই সহ্য

করিব না।" এইভাবে তিনি সমস্ত বিপদ আপদ তুচ্ছ করিয়া হজরত ওসমানকে দুর্দ্দিনে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুফিয়া দয়াবতী ও দানশীলা ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি স্বীয় বাসগৃহখানি দরিদ্রের হিতার্থে দান করিয়া যান। তাঁহার নম্র ও সদয় ব্যবহার আদর্শস্থানীয় ছিল।

মুস্‌লিম ব্যবহারতত্ত্বে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। বহু মহিলা জ্ঞানলাভের আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন।

হজরতের উপর তাঁহার অপরিসীম প্রেম ও ভক্তি ছিল। হজরত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইলে এই মহীয়সী মহিলা আবেগভরে বলিয়াছিলেন,—"হে আল্লা'র রসুল, যদি আপনার পীড়া আমায় আক্রমণ করিত।"

পয়গম্বর দুহিতা ফাতিমা

হজরত ফাতিমা নূরনবী হজরত মোহাম্মদের দুহিতা এবং মহাবীর হজরত আলীর সহধর্ম্মিণী। আলী ছিলেন দরিদ্র, সেইজন্য ফাতিমাকেও দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া কালাতিপাত করিতে হইত। পয়গম্বর দুহিতা হইয়াও তিনি অতি সাদাসিধেভাবে জীবন যাপন করিতেন। নিজ হস্তে তিনি সমস্ত প্রকার কায়িক পরিশ্রম করিতে

বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা-গৌরব বা অহঙ্কার ছিল না।

ফাতিমার স্বামীভক্তি ছিল খুবই প্রগাঢ়। তিনি স্বামীর সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইয়া সন্তোষ অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিতেন। একদিন হজরত আলী খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য বাজারে গিয়াছেন। ফাতিমা রুটি প্রস্তুত করিবার জন্য স্বামীর আগমন অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। আলী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তিনি বাজারে যাহা ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা সবই দান দুঃখীর দুঃখ দূরীকরণার্থে দান করিয়া দিয়াছেন। ফাতিমা এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সেই রাত্রির মত উপবাসে কাটাইলেন। দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থে কত শত শত দিবা ও রজনী যে তাঁহার অনাহারে কাটাইতে হইয়াছে তাহার কোন হিসাব নাই।

ফাতিমা ছিলেন আদর্শ মুস্‌লিম নারী। নিজে না খাইয়া তিনি দরিদ্র ও এতিমদিগকে খাওয়াইতেন। পরোপকার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। অপরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। একবার তিনি পরপর তিনদিন যে রুটী তৈয়ার করিয়াছিলেন

তাহা ভিক্ষুকদিগকে দান করিয়া নিজে উপবাসে কাটাইয়াছিলেন।

ফাতিমা একজন সুকবি ও বক্তা ছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার স্বামী হজরত আলীর সহিত তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সময় আলোচনায় রত থাকিতেন।

বীর রমণী খাওলা

মুস্‌লিম জগতের খ্যাতনাম্নী বীরাঙ্গনা খাওলার বীরত্ব কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি আরবের এক সম্ভ্রান্ত ঘরের রমণী, খাওলা মহাবীর দেরারের ভগ্নী। খৃষ্টান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি মুস্‌লিম সৈন্যদলে যোগদান করেন। মুস্‌লিম সৈন্যগণ দামেস্ক হইতে আজনাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় বীরাঙ্গনা খাওলা অন্যান্য কতিপয় নারীসহ খৃষ্টানদের হস্তে বন্দিনী হইয়া রোম শিবিরে নীত হন। খৃষ্টান সৈন্যগণ বন্দিনী মুসলিম বীরাঙ্গনাদিগকে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইলেন। সুন্দরী খাওলা সেনাপতি পিটারের ভাগে পড়িলেন।

বীর রমণী যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের আত্মসম্মান ও ধর্ম্ম সব কিছুই যাইতে বসিয়াছে তখন অন্যান্য আরব রমণীদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন :

"আমরা বীরের জাতি হইয়া কি কাফেরের হস্তে কলুষিত হইব? এইরূপে লাঞ্ছিতা হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।" যুদ্ধের কোন অস্ত্র তাঁহাদের নিকট ছিল না। খাওলা ও অন্যান্য রমণীগণ শিবির-দণ্ড লইয়া শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বীরাঙ্গনাগণ যখন বন্দী শিবিরের মধ্যে থাকিয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধে রত, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মুস্লিম সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। খাওলার অসীম বীরত্ব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল।

সৈয়দা সকিনা

কারবালার মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর সহিত সৈয়দা সকিনার নাম বিজড়িত। সদ্য-বিবাহিতা তরুণী সকিনা স্বীয় বংশগৌরব রক্ষার্থে স্বামীর সহিত কারবালার প্রান্তরে উপস্থিত হন। কাসেম কারবালার প্রান্তরে নিহত হইলে সকিনা বিধবা ও অসহায় হইয়া পড়েন। স্বামীর অকাল মৃত্যুতে তিনি একেবারে মুহ্যমানা হইয়া পড়েন।

কিন্তু আল্লা'র প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল খুবই গভীর। অতঃপর তিনি আল্লা'র উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই বন্দেগিতে রত হইলেন।

সকিনা হজরত মোহাম্মদের প্রিয়তম দৌহিত্র সহীদ এমাম হোসেনের কন্যা। তিনি অশেষ গুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। সে যুগের নারীদের মধ্যে তিনি গুণে, সৌন্দর্য্যে ও রসিকতায় অগ্রণী ছিলেন। দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তাহার বাসগৃহে অহরহ দার্শনিক, কবি, আইনজ্ঞ এবং সর্ব্বশ্রেণীর ধার্ম্মিক ও শিক্ষিত লোকের সমাবেশ হইত। ধর্ম্মতত্ত্ব ও জ্ঞানের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি তাঁহাদের সহিত প্রায়ই আলোচনায় রত থাকিতেন।

সকিনা একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত তিনি কবিতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সকিনার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা নারী সে যুগে আর একটীও ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় আদর্শ নারী সমগ্র মুস্‌লিম জগতের গৌরবের ধন।

তাপসী রাবেয়া

রাবেয়া বিখ্যাত তাপস মহাত্মা হাসান আল বসরীর শিষ্যা। তিনি এক দরিদ্রের কুটীরে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রথমে রাবেয়া জনৈক সম্ভ্রান্ত গৃহের দাসীরূপে জীবন আরম্ভ করেন। প্রভুর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার গৃহ হইতে পলায়ন করেন। অতঃপর রাবেয়া আল্লা'র ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন। তাঁহার আকুল ক্রন্দন নিশ্চয়ই আল্লা'র দরবারে পৌঁছিয়াছিল। ঐশী বাণী হইল, "বৎস, দুঃখ করিও না, অচিরেই তোমার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে।" রাবেয়া প্রভুগৃহে ফিরিয়া গেলেন। প্রভুর গৃহে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যখনই সময় পাইতেন তখনই তিনি আল্লা'র প্রার্থনায় মশগুল থাকিতেন। তাঁহার খোদা-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া প্রভু তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এই সময় হইতে তিনি কঠোর তপস্যায় আত্ম-নিয়োগ কনে র।

স্বর্গীয় প্রেমের আভায় রাবেয়ার দেহ ও মন আলোকিত হইল। তাঁহার মূল্যবান উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য দলে দলে শিষ্যমণ্ডলী আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। মহাত্মা হাসান আল বস্‌রী তাঁহাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন তিনি স্বীয় অনুষ্ঠিত সভায় রাবেয়াকে অনুপস্থিত দেখিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। কেহ তাঁহাকে বলিলেন, "সামান্য

একজন বৃদ্ধা নারীর জন্য কেন আপনি অপেক্ষা করিতেছেন?" তদুত্তরে হাসান বলিলেন, "যে সরবত হস্তীর উদরের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহা পিপীলিকার মুখে দিতে পারি না।"

রাবেয়া দীনা ভিক্ষুকের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। তিনি আল্লা'র অনুগ্রহ ব্যতীত কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশা রাখিতেন না।

আরবের নারী শিক্ষা ও সংস্কৃতি

নূরনবী হজরত মোহাম্মদ আরব-মরুর বুকে যে স্বর্গীয় বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহারই আলোকে সারাজাহান আলোকিত হইয়াছিল। মুস্‌লিম প্রাধান্যের যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা প্রশাখা ছিল না যাহা মুসলমানেরা অনুশীলন করে নাই। ইস্‌লামে নারীর মর্য্যাদা, তাহার সামাজিক অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ইস্‌লামের সাম্যবাদ আর কোন ধর্ম্মে দৃষ্টিগোচর হয় না। আরব সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে নারীরা ব্যবসায় বাণিজ্য করিত, রাজকার্য্য পরিচালনা করিত, প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করিত এবং জাতীয় বিপদের দিনে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করিত। হজরত মোহাম্মদ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নরনারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা ফরজ।" সে যুগের মুস্‌লিম নারীরা হজরতের এই বাণীর অনুসরণ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রথমেই পর্দ্দা প্রথা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উহা একটি প্রধান অঙ্গ। বর্ত্তমান

যুগের ন্যায় সে-যুগে পর্দ্দা প্রথার বাড়াবাড়ি ছিল না, অথচ বর্ত্তমানের অতি আধুনিকতাপূর্ণ বেয়াড়া বেপর্দ্দাও বলা চলে না। উহা ছিল সুমার্জ্জিত এবং খাঁটি ইস্‌লামী পর্দ্দা। সেকালে যুদ্ধকার্য্য, সামাজিকতা এবং জাতির উন্নতির প্রচেষ্টার সহিত পর্দ্দাপ্রথার অতি নিখুঁত সামঞ্জস্য ছিল।

অতি প্রাচীন যুগে পারস্যদেশে পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। ইস্‌লাম বিস্তারের প্রাথমিক যুগে আরব দেশে কড়াকড়ি পর্দ্দাপ্রথা ছিল না। ঐতিহাসিকগণের মতে ওমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওলিদের রাজত্বকাল হইতে পারস্যদেশের পর্দ্দাপ্রথা মুস্‌লিম সমাজে প্রবেশ করে। সেই সময় হইতে মুস্‌লিম সমাজে পর্দ্দা রক্ষা করা ধর্ম্মের একটি অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। পর্দ্দাপ্রথার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে কত মতবাদের যে সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ইয়ত্ত্বা নাই।

আরবের নারীদের বিষয় বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই হজরত আয়েশার কথা বলিতে হয়। তা'ছাড়া আদর্শ নারীদের মধ্যে ফতিমা, সৈয়দা সকিনা, রাবেয়া প্রভৃতি বহু রমণী জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েকজনের পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। বর্ত্তমানে

আমরা আরবের আরও বহু মহীয়সী মহিলা এবং নারী-শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রাথমিক যুগের নারীদের মধ্যে সুফিয়া ও আসমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুফিয়া হজরতের পিতৃব্য-পত্নী। মদিনার যুদ্ধবিগ্রহে তিনি প্রায়ই অংশ গ্রহণ করিতেন। হজরত আয়েশার ভগ্নী আসমা একজন খ্যাতনাম্নী বীরাঙ্গনা ছিলেন। স্বামী জুবায়েরের সহিত তিনি বহুবার রোমান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ্ যখন মক্কায় ওমাইয়া গোত্রের সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন তখন এই বীর রমণী পুত্রকে তরবারী ধারণ করিয়া শত্রুর সহিত আমরণ যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আরবগণ যুদ্ধপ্রিয় ছিল। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেই যুদ্ধে যোগদান করিত। সৌন্দর্য্য ও বীরত্ব—এই দুইটী গুণ রমণীদের পাশাপাশি অবস্থান করিত। হারেসের কন্যা উম্মুল খায়ের সিফ্ফিনের যুদ্ধে হজরত আলীর সপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি জনসভায় বক্তৃতা দিয়া আরববাসীদিগকে যুদ্ধে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইতেন। তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া দলে দলে আরবেরা যুদ্ধে যোগদান করিত। আ'দীর কন্যা

জারকা আলীর নারী সৈন্যদলের মধ্যে বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। জুবায়েরের ভগ্নী জয়নব বাগ্মী ও বীরাঙ্গনা ছিলেন। তাঁহার খ্যাতি আরব জগতের ঘরে ঘরে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

হজরত মোহাম্মদের সময় আম্মিয়া গফ্‌ফারী নাম্নী এক রমণী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। বিখ্যাত যোদ্ধা আসমা আনসারীর বীরত্ব গাঁথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি নিজ হস্তে নয় জন খৃষ্টান সৈন্যকে হত্যা করিয়াছিলেন। আসেমের কন্যা সুদা সিরিয়ার খৃষ্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সা'দের কন্যা সালমা রোমান এবং পার্সিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। সে যুগের বীরাঙ্গনাদের মধ্যে জি'রের কন্যা সালমা, আগ্‌হা বেগী, উম্মুল-আম্‌রা প্রভৃতি রমণী বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া-ছিলেন।

বিখ্যাত খলিফা হারুনার রসীদের রাজত্বকালে লায়লা নাম্নী একজন মহিলা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি খারিজী বিদ্রোহের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়া অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেনাপতির পদে অধি-ষ্ঠিত হইয়া তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত খলিফা হারুনার

রসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করিয়াছিলেন। বীর রমণী লায়লা তাঁহার বীরত্বের জন্য ইতিহাসে আরবের 'জোয়ান-অব-আর্ক' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ইবনে খালিকান তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—'আল-ফেরিয়া'। লায়লা একজন অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী ছিলেন। তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব শক্তির খ্যাতি সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

খ্যাতনাম্নী মহিলা কবি ফজল মুতওয়াক্কিলের সময় বাগ্‌দাদ নগরীতে আগমন করেন। তাঁহার সুললিত কবিতাগুচ্ছ তখনকার দিনে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। শেখ সুদা ষষ্ঠ হিজরীর একজন খ্যাতনাম্নী মহিলা। তিনি বাগ্‌দাদে ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর ছিল এবং সেজন্য তাঁহার খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এ যুগে জয়নব উম্মুল মোয়াবিদ নামক আর একজন মহিলা পণ্ডিত বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে বহু খেতাব পাইয়াছিলেন। মুস্‌লিম ব্যবস্থাবিজ্ঞানে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল এবং সেইজন্য তিনি আইন শিক্ষা দেওয়ার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঐসেতের বীর খ্যাতনামা সুলতান খালাহ্‌উদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং নুরুদ্দীনের কন্যা—'Academia Adhrawiyyah এবং দামেস্কে আরও দুইটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। আবুল ফারাজের কন্যা তকীয়া হাদীস সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতেন এবং সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন।

আরব নারীদের অনেকেই বাগ্মী, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ এবং হাদীসের সঙ্কলক ও বর্ণনাকারী (রা'বী) ছিলেন। এমাম হোসেনের ভগ্নী জয়নব একজন সুবক্তা ছিলেন। সীত-উল-উলেমা নাম্নী একজন আরব মহিলা সুমধুর বক্তৃতা দানের জন্য 'বুলবুল' উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছিলেন। বাগ্‌দাদের আব্বাসের কন্যা ফাতিমা উচ্চ মঞ্চে দণ্ডায়মানা হইয়া স্ত্রী পুরুষের সম্মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। বিখ্যাত ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ বদ্‌রুদ্দীন এই মহিলার অনুপস্থিতিতে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে পারিতেন না। ফাতিমা নাম্নী আরও বহু নারী হাদীস ও ধর্ম্মতত্ত্বে পণ্ডিত ছিলেন।

আবহমানকাল হইতে মানুষ সৌন্দর্য্যের উপাসক। আরবগণও উহা হইতে রেহাই পান নাই। পিতা সুশিক্ষিতা এবং সুন্দরী কন্যার নাম নিজ নামের সহিত

সংযোগ করিতে গর্ব্বানুভব করিতেন। বীরগণ সুন্দরী প্রিয়তমাদের নাম লইয়া বীরবিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। আরব মহিলাগণ অন্তরে বিন্দুমাত্র কুভাব পোষণ না করিয়া দস্তুরমত পুরুষদের সহিত গল্প, তর্ক ও আলোচনায় যোগদান করিতেন। বিশ্ববিশ্রুত কবি ফেরদৌসী সত্যই গাহিয়াছেন :—

"Lips full of smiles, countenance full
of modesty
Conduct virtuous, conversation lovely."

অর্থাৎ—"ওষ্ঠদ্বয় সুগন্ধময় আননে নম্রতা
সুপবিত্র আচরণ বাক্যে তেজস্বিতা।"

বিখ্যাত লেখক আল মোফাজ্জাল এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মরুপথ ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি এক বাড়ীতে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আঙ্গিনায় উপস্থিত হইবামাত্র সুমধুর নারী কণ্ঠের শব্দ শ্রুত হইল। তিনি স্বীয় উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন। ভিতরে যাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মনে হইল যে বিজলী চমকিয়া উঠিল। এক পরমা সুন্দরী রমণী তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আগন্তুক

যখন সুন্দরীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন সেই সময় রমণীর দাদী আসিয়া আগন্তুককে সাবধান করিয়া দিলেন যেন তিনি সুন্দরীর যাদুর ফাঁদে না পড়েন। বলা বাহুল্য আরবদের আতিথেয়তা সর্ব্বজনবিদিত। যে কোন অতিথির মনস্তুষ্টির জন্য স্ত্রী পুরুষ সকলেই আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিত। উহাতে চরিত্রের কতখানি দৃঢ়তা থাকা দরকার তাহা সম্যক উপলব্ধি করা প্রয়োজন। চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকিলে মুসলমানদের গগনচুম্বি ইমারতের ধ্বংস যে প্রারম্ভেই হইত তাহা বলা অনাবশ্যক।

ওমাইয়া বংশের রাজত্বকালে বিখ্যাত কবি খারকার অপরূপ সৌন্দর্য্যের খ্যাতি সারা জাহানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একজন তীর্থযাত্রী তাঁহার দর্শন লাভের আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কথোপকথনে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। রমণী তীর্থযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি পূর্ব্বে কোন সময় তীর্থে আসিয়াছেন?" উত্তর হইল— "কয়েকবার আসিয়াছি।" "তবে কি জন্য আমার দর্শন লাভ করেন নাই? আপনি কি জানেন না যে আমিও তীর্থযাত্রীদের অন্যতম দর্শনীয় বিষয়।"

অপরূপ সৌন্দর্য্যের সহিত অগাধ পাণ্ডিত্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ এবং তদুপরি বীরত্ব ও চরিত্রের দৃঢ়তার সমন্বয়ে তখনকার আরব রমণীরা যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মাতৃত্বের উত্তরাধিকারিণী ছিলেন তাহাই প্রমাণিত হয়। তখনকার সমাজপতিদের নিপুণ পরিচালনাই যে ইহার মূল তাহা বলাই বাহুল্য।

ওমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমরের ভগ্নী এবং প্রথম ওলিদের স্ত্রী উম্মুল বনিন সে যুগের আর একজন সর্ব্বগুণসম্পন্না নারী ছিলেন। প্রজাসাধারণের সুখ সুবিধার্থে তাঁহার অনেক সময় ও চিন্তা ব্যয় হইত। হেজাজের শাসনকর্ত্তা কুখ্যাত হেজাজকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে তেজস্বী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রাথমিক যুগে নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ বর্ত্তমান যুগ হইতে অন্যরূপ ছিল। আরবে উচ্চশ্রেণীর রমণীরা মণিমুক্তাখচিত রঙ্গীন টুপি শিরভূষণস্বরূপ ব্যবহার করিত। টুপির ভিতরে মূল্যবান মুক্তাখচিত এক টুকরা সুবর্ণ থাকিত। খলিফা হারুনার রসীদের বৈমাত্রেয় ভগ্নী ওলাইয়া এই টুপির প্রবর্ত্তন করেন। মধ্যবিত্ত ঘরের নারীরা প্রশস্ত স্বর্ণালঙ্কার মস্তকে ব্যবহার করিতেন।

সম্রাজ্ঞী জোবেদার নাম দয়া ও বদান্যতার জন্য চিরস্মরণীয়া হইয়া আছে। তিনি জনসাধারণের অসুবিধা দূরীকরণার্থে বাগ্‌দাদে একটী বড় খাল খনন করেন। উহা নাহারে-জোবায়দা নামে খ্যাত। সম্রাজ্ঞী জোবায়দা স্যাডান চেয়ারের আবিষ্কার করেন এবং মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কারের ব্যবহার প্রচলন করেন। জোবায়দা একজন কবি ও সর্ব্বগুণান্বিতা রমণী ছিলেন। তিনি প্রায়ই হারুনার রসীদকে কবিতা রচনা করিয়া উপহার দিতেন। তাঁহার পুত্র আমীনের মৃত্যুর পর তিনি মামুনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। তিনি রাজ্য-মধ্যে বহু বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

খলিফা মামুনের স্ত্রী বুরান একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। জনহিতকর কার্য্যের জন্য তিনি সর্ব্বদা মামুনকে উৎসাহিত করিতেন। বুরান দয়াবত্তা ও দানশীলতার জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বাগ্‌দাদে নারীদের চিকিৎসার জন্য কয়েকটী হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

খলিফা মনসুরের সময় দুইজন আরব তরুণী মারওয়ানের সহিত যুদ্ধের সময় একটী প্রতিজ্ঞা

করিয়াছিলেন এবং উহা রক্ষাকল্পে তাঁহারা বর্ম্মাবৃতা হইয়া রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন। হারুনার রসীদের সময় আরবের যুবতীরা অশ্বারূঢ়া হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিতেন।

খলিফা মুক্তাদিরের মাতা একজন আইনজ্ঞ ছিলেন। তিনি আপীল কোর্টে সভাপতিত্ব করিতেন। তিনি আপীলের দরখাস্ত সমূহ মন দিয়া শ্রবণ করিতেন এবং রাজদরবারে আমীর ওমরাহ ও বৈদেশিক রাজদূতদিগের সম্মুখে দক্ষতার সহিত বিচারকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

খলিফা মামুনের রাজত্বকালে ওবায়দা নাম্নী একজন অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল।

সে যুগে আরব সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষিতা নারীদের পরস্পর সাক্ষাৎ, ভাবের আদান প্রদান এবং সভাসমিতি অবাধে চলিত। মামুন এবং রসীদের সময় আরবের নারীরা পুরুষদিগের সঙ্গে সমালোচনা, রসিকতা এবং কবিতা আবৃত্তি লইয়া প্রতিযোগিতা করিতেন।

পারস্য প্রথানুসারে আরবের মহিলারা ঠোঁটে তাম্বুল ব্যবহার করিতেন এবং কৃত্রিম উপায়ে নিজেদের সৌন্দর্য্য

বর্দ্ধন করিবার প্রয়াস পাইতেন। আতর, গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের বহুল প্রচলন ছিল।

প্রত্যেক জাতিরই একটী স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যবোধ আছে। ইউরোপে যেরূপ নারী-সৌন্দর্য্যের বিচার ভারতে তাহার কোন মিল নাই। ভারতীয় সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি চীন ও জাপান হইতে পৃথক্। আরব সমাজেও নারীদের সৌন্দর্য্যের একটা মাপকাঠি ছিল। আরবগণ উজ্জ্বল, লম্বা, পাতলা গঠন অথচ মানান সই—সুন্দর, লম্বা, কাল, বড় চক্ষুবিশেষ নারীকেই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরের পর্য্যায়ে ফেলিত। নীলবর্ণ চক্ষুও আরব নারীর সৌন্দর্য্যের অঙ্গীভূত ছিল। গাঢ় নীলবর্ণ চক্ষুর জন্য ইমামার বিখ্যাত সুন্দরী তরুণী জারকার নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

সঙ্গীতশিল্পে ও কবিতা রচনায় আরবের নারীরা জগতের অন্য কোন দেশের নারীদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিলেন না। আরবের নারীরা যখন সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন তখনও সঙ্গীত চর্চ্চা মুস্‌লিম সমাজে রহিত হইয়া যায় নাই। উচ্চ, নীচ প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর রমণীরা সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন। যুবরাজ্ঞী ওলাইয়া একজন খ্যাতনাম্নী সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। আবুল ফারাজের 'কিতাব-উল-

আগানী' নামক সঙ্গীত পুস্তকে তাঁহার সঙ্গীত রচনার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর তরুণী ও যুবরাজ্ঞীরা একত্রিত হইয়া সায়াহ্নে সঙ্গীতের আসর জমাইতেন। একজন পরিচালিকা বেত্রদণ্ডহস্তে গায়িকাদের নাট্যমঞ্চ (Orchestra) পরিচালনা করিতেন। রাজকুমারী ও সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাগণ স্ব স্ব বাসভবনে সঙ্গীতের জলসা বসাইতেন। এই সমস্ত জলসার নাম ছিল নওবত-উল-খাতুন। নাচ ও গান সর্ব্বশ্রেণীর কুমারী ও যুবরাজ্ঞীগণের অতি আদরের সামগ্রী ছিল।

উপরে আমরা আরবের নারী সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে চিত্র অঙ্কিত করিলাম তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে উহার চেয়ে বেশী আলোচনা করা সম্ভবপর হইল না। পাঠক পাঠিকাগণ এই বর্ণনা হইতে সে যুগের আরব নারীদের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। মুসলমান জাতি যতদিন পর্য্যন্ত জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয় ততদিন এ অধঃপতিত জাতির উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আধুনিক বাঙ্গলার মুস্‌লিম মহিলারা শরৎ ও বঙ্কিমের দুই চারিখানি উপন্যাস পড়িয়া এবং রবীন্দ্রনাথের দুই চারিটী লাইন

আওড়াইয়া মনে করেন বেশ কিছু শিখিয়াছেন। জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে কয়জন মহিলা প্রকৃত খবর রাখিয়া থাকেন এবং জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করেন। ইহার জন্য সমাজের পুরুষ এবং নারী উভয়েই সমানভাবে দায়ী। আমাদের ভগিনীদের কয়জন মুস্‌লিম বঙ্গের খ্যাতনাম্নী মহীয়সী মহিলা রোকেয়ার সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর রাখেন? এই সমস্ত বিষয় জাতির সেবক এবং সেবিকাগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমার এই সমালোচনা সার্থক হইবে।

মোগল সভ্যতায় নারীর প্রভাব

মহামতি বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মধ্য এশিয়ার বর্ব্বর লুণ্ঠনকারী চেঙ্গিস্‌খানের বংশধর। চেঙ্গিস্, হালাকু, মঙ্গুখাঁন প্রভৃতি বর্ব্বর সর্দ্দারগণ মোগলদের পূর্ব্বপুরুষ। এক সময় সমগ্র এশিয়া তাঁহাদের আক্রমণ-ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়—যে মূহুর্ত্তে এই বংশের লোকেরা ইস্‌লাম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল তখনই তাঁহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলে মোগলদের জন্মভূমি সমরখন্দ ও বোখারা মুস্‌লিম সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হইয়া উঠিল।

বাবরের পূর্ব্বে মোগলগণ বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন কিন্তু দেশ জয় বা রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। বাবরই এদেশে মোগল সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করেন। মোগলেরা ভারতবর্ষে যে সভ্যতা বিস্তার সাধন করিয়াছেন তাহা এদেশের অন্য কোন রাজবংশের সহিত তুলনা চলে না। শিল্পকলা, সাহিত্য, স্থপতিবিদ্যা, রাজ্যশাসন

প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহারা এক অভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

মোগল সভ্যতা বিস্তারে পুরনারীরাও অবাধে অংশ গ্রহণ করিতেন। রাজকার্য্য, জ্ঞানচর্চ্চা, শিল্পকলা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই নারীরা যোগদান করিতেন। হুমায়ুন হইতে আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত সমস্ত সম্রাটগণের উপর নারীদের প্রভাব প্রভূত পরিমাণে পতিত হইয়াছিল। নারীরা পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়াও স্বাধীনভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেন। তাঁহারা শুধু পুরুষদের বিলাসের উপাদান মাত্র হইয়া জীবন কাটাইতেন না, শিল্পকলা, কাব্য ও সঙ্গীত চর্চ্চা দ্বারা নারী জীবনকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। শিকারের জন্য রক্ষিত জঙ্গল, বন, উপবন, ভ্রমণের জন্য কাশ্মীরের শত শত ঝরণা, উপত্যকা ও চেনার বাগ প্রচুর ছিল। উহা ছাড়া রাজধানীর মধ্যে আঙ্গুরীবাগ, বাহিরে যমুনার তীরে উন্মুক্ত ময়দান ও নগরের উপকণ্ঠে প্রশস্ত বাগিচা এবং প্রাচীর বেষ্টিত জলাশয় ও ফোয়ারা ছিল। মোগল নারীরা হাতীর উপর পর্দ্দাঘেরা হাওদায় চড়িয়া কাশ্মীর ভ্রমণে যাইতেন। ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি দেশের সুশিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না ললনাগণের সমাবেশ মোগল অন্তঃপুরে এক বৈচিত্র্যময়

আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ইহাই নারীশিক্ষার পথ সুগম ও সহজ করিয়া তুলিয়াছিল।

অনেকে মনে করেন বাদশাহী আমলে অন্তঃপুরের নারীরা শিক্ষার আলোক হইতে দূরে থাকিতেন। ইতিহাস পাঠকমাত্রই ইহা অস্বীকার করিবেন। ভারতে আফগান শাসনকালে সুলতানা রিজিয়া দিল্লীর মস্‌নদে অধিরোহণ করিয়াছিলেন এবং মোগল শাসনকালে নূরজাহান বেগম হইয়াও বাদশাহের ন্যায় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

বিদূষী রিজিয়া কোর্‌-আনে বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কি প্রজাপালনে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে—সর্ব্ব ব্যাপারেই তিনি অতুলনীয়া ছিলেন। মাহ্‌ মালিক আফগান যুগের আর একজন খ্যাতনাম্নী মহিলা। ঐতিহাসিক মিনহাজ্‌উদ্দীন বলেন,—"তাঁহার হস্তাক্ষর রাজঅঙ্গশোভী মুক্তার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন ছিল।" ফিরিশ্‌তা বলেন, যে মালবের সুলতান গিয়াস্‌উদ্দীনের হারেমে পঞ্চদশ সহস্র মহিলা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু শিক্ষয়িত্রী ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌ ছিলেন। সুলতান জালাল্‌উদ্দীন ফিরোজের হারেমের নারীদের অনেকেই কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

মুসলমান সমাজে নারীরা যে পুরুষের সমপর্য্যায়ে যে কোন কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন তাহা মোগল নারীদের ইতিহাস পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়। যে সমস্ত মহীয়সী মহিলা মোগল হারেমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতীক্ ছিলেন তাঁহাদের বিষয় আমরা অতি সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করিব।

গুলবদন

গুলবদন সম্রাট বাবরের কন্যা। তিনি বাবর, হুমায়ূন ও আকবরের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। চরিত্রের পবিত্রতা, দানশীলতা ও জ্ঞান গরিমায় এই মহিলা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। প্রথম তিনজন মোগল সম্রাটের রাজ্যশাসন প্রণালী স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুমায়ূন নামা' রচনা করিতে সহায়ক হইয়াছিল। এই মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ তাঁহার জীবনের গৌরবময় কীর্ত্তি। এইজন্যই তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এই গ্রন্থখানিতে মোগল ইতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। মিসেস্ বিভারীজ 'হুমায়ূন নামা'র ইংরাজী অনুবাদ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

গুলবদনের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে একদা সম্রাট আকবর তাঁহাকে অনুরোধ করেন, "বাবর ও হুমায়ুন সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত আছেন লিপিবদ্ধ করুন।" গুলবদন তখন হইতে 'হুমায়ূন নামা' রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থ ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। আবুল ফজল সম্ভবতঃ তাঁহার 'আকবর নামা' প্রণয়নে এই গ্রন্থ হইতে বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'হুমায়ূন নামা'য় তৎকালীন মোগল পরিবারের সঠিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। মোগল যুগের ইতিহাস প্রণয়নকারীদের পক্ষে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী।

'হুমায়ুন নামা' ব্যতীত গুলবদন অনেক সুমধুর কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মীর মেহ্‌দী শিরাজীর 'তাজকিরা-তুল-খাওয়াতিনে' তাঁহার কতিপয় কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। গুলবদনের অধ্যয়ন-স্পৃহা অসাধারণ ছিল। তিনি একটী পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সলীমা বেগম

আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হয়। ফতেপুর

সিক্রির প্রাসাদে আকবর মোগল পুরনারীদের জন্য একটি পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করেন। আকবরের সময় যে দুইজন রমণী জ্ঞানগরিমায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে প্রথমেই সলীমা বেগমের নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি রাজ-অন্তঃপুর ললনাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুরা, বুদ্ধিমতী এবং বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয়া রমণী ছিলেন। সলীমা হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভগ্নী গুলরুখের কন্যা। বৈরাম খানের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বৈরাম হুমায়ুনের সেনাপতি ছিলেন। অমরকোটের মরুভূমি হইতে পারস্য এবং তথা হইতে ভারতের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার পর্য্যন্ত বৈরাম হুমায়ুনের সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেন। বৈরামের অমিত-বিক্রমে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর মস্‌নদ অধিকার করেন। বৈরামের বীরত্ব ও বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হইয়া হুমায়ুন সলীমার ন্যায় নারী-রত্নকে তাঁহার করে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। বৈরামের সহিত সলীমার বিবাহ হওয়ায় তিনি রাজপরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। বিবাহের মাত্র তিন বৎসর পরেই বৈরামের অকাল মৃত্যুতে সলীমা বিধবা হইয়া পড়েন। এহেন রমণী-রত্নকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার মত উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া

গেল না বিধায় সম্রাট আকবর তাঁহাকে নিজের বেগম করিয়া লইলেন।

সলীমা সপত্নী সন্তান সেলিমকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নয়নের পুত্তলি সেলিমকে তিনি স্বীয় পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিতেন। সেলিম যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন তখন এই মহীয়সী মহিলা স্বয়ং এলাহাবাদে আগমন করিয়া পুত্রকে অনেক বুঝাইয়া পিতৃসন্নিধানে লইয়া যান। এই বিদুষী ও বুদ্ধিমতী মহিলার মধ্যস্থতা ব্যতীত বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইত কিনা সন্দেহ।

বিদুষী সলীমার অধ্যয়ন-স্পৃহা অতীব প্রগাঢ় ছিল। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সুকবিও ছিলেন। সলীমা 'মাক্‌ফী' (গুপ্ত ব্যক্তি) নাম দিয়া বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক কাফি খাঁ (মোহাম্মদ হাসিম) তাঁহার গ্রন্থে সলীমাকে 'খাদিজা-উজ-জামিনী' অর্থাৎ—'বর্ত্তমান যুগের খাদিজা' (হজরত মোহাম্মদের প্রিয়তমা স্ত্রী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে সলীমার গুণ-গরিমা, মানসিক উৎকর্ষতা ও সুশিক্ষার প্রশংসা করিয়াছেন।

মহম আনকা

সম্রাট আকবরের রাজদরবারে যে সমস্ত মহিলা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে মহম আন্‌কার নাম সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই মহিলা আকবরের ধাত্রীমাতা ছিলেন। বৈরাম খানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য আকবর তাঁহার মাতা হামিদা বানু বেগম, মহম আন্‌কা এবং দিল্লীর শাসন কর্ত্তা শিহাবুদ্দীনের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এই সমস্ত ব্যাপারে মহম আন্‌কা প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন মহম আন্‌কা আকবরের প্রধান পরামর্শদাতারূপে কার্য্য করিতেন। ডক্টর ভিয়েনসেণ্ট স্মিথ্‌ বলেন, আকবর বৈরামের অভিভাবকত্বের শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া মহমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক আকবরের উপর নারীদের প্রভাব সম্বন্ধে 'so-called petticoat Government' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মোগল যুগে যে সমস্ত মহিলা শিক্ষা বিস্তারকল্পে অগ্রণীয়া ছিলেন তাহাদের মধ্যে মহম অন্যতম। তিনি নিজে একজন সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন এবং শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে দিল্লী নগরীতে একটী মাদ্রাসা স্থাপন

করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় 'মহম আন্‌কার মাদ্রাসা' বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমানে ইহার কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না।

নূরজাহান

নূরজাহানের প্রকৃত নাম মেহেরুন্নেসা। তাঁহার জীবনের সহিত অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা বিজড়িত। তিনি ইরাণ দেশের মীর্জ্জা গিয়াস বেগ নামক জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তির কন্যা। কি ভাবে পিতামাতা কর্ত্তৃক পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া বণিকদের সাহায্যে লালিতা পালিতা হইয়া মোগল দরবারে নীত হইয়াছিলেন তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। পিতার সহিত মোগল দরবারে এবং রাজ-অন্তঃপুরে যাতায়াত করার সুযোগে রাজকুমারী-দের গতিবিধি তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মেহেরুন্নেসার অলোকসামান্য রূপে মোগল দরবারও আলোকিত হইয়া গিয়াছিল। যুবরাজ সেলিম তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই ছিল না। মেহেরুন্নেসা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সম্রাট আকবর তাঁহাকে আলী কুলী ইস্‌তাজুল ওরুফে শের আফগানের সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন।

পিতার মৃত্যুর পর সেলিম 'জাহাঙ্গীর' (ভুবন জয়ী) উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর মস্‌নদে আরোহণ করেন। রাজত্বের প্রারম্ভেই বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা শের আফগান বিদ্রোহ ঘোষণা করায় জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য কুতুবুদ্দীনকে প্রেরণ করেন। মোগল সৈন্যের সহিত শের আফগানের এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুতুবুদ্দীন শের আফগানকে নিহত করেন। বিধবা মেহেরুন্নেসা এবং তদীয় কন্যা লাডলী বেগম দিল্লীতে নীত হন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক শের আফগানের হত্যার জন্য জাহাঙ্গীরকে দায়ী করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে সম্রাটের কোন হাত ছিল না। 'History of Jahangir'এর লেখক ডক্টর বেণীপ্রসাদ যুক্তি তর্ক ও প্রমাণের সাহায্যে ঐতিহাসিকগণের এই ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। তাঁহার মতে নূরজাহানকে বিবাহ করিবার জন্য শের আফগানের হত্যার কাহিনী সম্পূর্ণ হাতে গড়া। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এবিষয়ের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। যে সমস্ত বৈদেশিক পর্য্যটক মোগল অন্তঃপুরের খুঁটিনাটী বিষয় লইয়া অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও এ কাহিনী সম্বন্ধে নির্ব্বাক। এক মাত্র

ডাচ্ লেখক ডি লাইট বলেন যে নূরজাহানের কুমারী অবস্থায় জাহাঙ্গীর তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ের কোন সঠিক প্রমাণও পাওয়া যায় না। ডক্টর বেণীপ্রসাদের মতে পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনা পরবর্ত্তী যুগের লেখকগণের কল্পিত কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শের আফগানের নিহত হইবার চারি বৎসর পরে জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নেসাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে 'নূরজাহান' বা জগতের আলো উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্রাজ্ঞী হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে নূরজাহান অল্পকালের মধ্যেই সাম্রাজ্য এবং সম্রাটকে আপন আয়ত্তাধীনে আনয়ন করেন। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগ নূরজাহানের রাজত্বকাল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি নিজ আত্মাকে নূরজাহানের আত্মার সহিত বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর বলিতেন, "নূরজাহানকে আমি প্রখর বুদ্ধিমতী এবং রাজ্য পরিচালনা করিবার উপযুক্তা মনে করিয়া তাঁহার উপর শাসন ভার অর্পণ করিয়াছি।" তখন হইতে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য

নূরজাহানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। জাহাঙ্গীর তাঁহার হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন।

নূরজাহান অতিশয় দয়াবতী রমণী ছিলেন। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদিগকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। কিসে প্রজাসাধারণের মঙ্গল হইবে সে জন্য সর্ব্বদা তিনি চিন্তিত থাকিতেন। এতিম বালক বালিকাদিগের প্রতি তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না। কথিত আছে তিনি নিজ ব্যয়ে পাঁচ শত দরিদ্র বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন।

বিদুষী নূরজাহান নিজে যেরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য-শালিনী ছিলেন তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধও তেমনই অসাধারণ ছিল। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি, ললিত ও শিল্পকলায় জ্ঞান অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহার সৌজন্যে ঢাকার সূক্ষ্ম মস্‌লিন শাড়ী মোগল অন্তঃপুরে আদৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, 'আতর-ই-জাহাঙ্গীরী' নামক গোলাপ নির্য্যাস তিনিই আবিষ্কার করেন। পেশোয়াজের দুদানী, ওড়নার পাচতোলিয়া, বাদলা, কিনারী, নূরমহলা এবং ফরস-ই-চন্দনী (চন্দন কাষ্ঠের বর্ণ বিশিষ্ট কার্পেট) তাঁহারই কারু-কল্পনার ফল। বিভিন্ন রুচিসম্মত স্বর্ণালঙ্কার ও নারীদের বেশভূষা প্রচলন করিয়া নূরজাহান তাঁহার অতুলনীয়

সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন। আপাদলম্বিত নিটোল এবং ওড়নার ব্যবহার তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

নূরজাহান রন্ধন কার্য্যেও বিশেষ পারদর্শীনী ছিলেন। সম্রাটের তৃপ্তি সাধনের জন্য তিনি নিত্য নূতন মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাঁহার রন্ধন কার্য্যের সুখ্যাতি রাজ্যময় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি ভোজ্য দ্রব্যগুলি অভিনব প্রণালীতে দস্তারখানে সাজাইয়া দিতেন। ইহা হইতে তাঁহার সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

মোগল স্থাপত্যশিল্পে নূরজাহানের দান অতুলনীয়। তাঁহার নির্ম্মিত উদ্যান, প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যরাজি হইতে গভীর শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর তাঁহার 'তুজক-ই-জাহাঙ্গীরী' (আত্মজীবনী) নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "তৎকালে এমন মহানগরী বা সহর ছিল না যেখানে নূরজাহানের কীর্ত্তিরাজি সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করে নাই।" নূরজাহান প্রতিষ্ঠিত 'নূর-সরাই' পথিকদের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করিয়া দিত। কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর তীরে ছায়াশীতল চেনার-বৃক্ষ সমন্বিত 'নূর আফ্‌খান' নামক উদ্যান তিনি নির্ম্মাণ করেন।

নূরজাহান বীরাঙ্গণা এবং একজন কূটরাজনীতিবিদ্ ছিলেন। জাহাঙ্গীর যখন সেনাপতি মোহাব্বত খানের

হস্তে বন্দী, তখন তিনি ছলে, বলে ও কৌশলে স্বামীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা শিকার করিতে যাইয়া নূরজাহান এক ভয়াবহ ব্যাঘ্র নিহত করেন। জাহাঙ্গীর উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের এক জোড়া মুক্তার হার উপহার প্রদান করেন এবং আনন্দাতিশয্যে অভিভূত হইয়া এক হাজার আসরফী দাস দাসীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান অতিশয় সঙ্গীতানুরাগীনী রমণী ছিলেন। তিনি সঙ্গীত চর্চ্চা অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার সুমধুর কলকণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণে শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

কবিতা রচনায়ও নূরজাহান খ্যাতি অর্জ্জন করেন। আরবী ও ফার্সি ভাষায় তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। ফার্সি ভাষায় তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। উপস্থিত মত কবিতা রচনা করিয়া নূরজাহান সম্রাটকে উপহার দিতেন।

সম্রাজ্ঞী হইয়াও নূরজাহান নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি জানিতেন জীবন ক্ষণস্থায়ী, ধনসম্পদ, সম্মান, প্রতিপত্তি কিছুই সঙ্গে যাইবে না। নূরজাহান নিজের সমাধিক্ষেত্রের জন্য জাহাঙ্গীরের চাক্‌চিক্যময় সমাধিক্ষেত্রের অনতিদূরে অতি সাদাসিদে ভাবে একটী ছোট ইমারত নির্ম্মাণ করাইয়া

গিয়াছিলেন। নূরজাহান মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কবরের গায়ে স্বরচিত এই কবিতাটী খোদাই করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ঃ

"বর মাজারে মা গরীবাঁ না চিরাগে না গুলে
না পরে পরওয়ানা সূজদ্ না সদায়ে বুলবুলে।"

—"দীন আমি, পতঙ্গের পক্ষ দহিবারে
জ্বেল না আলোক মম সমাধি আগারে।
আকর্ষিতে বুলবুল্ আকুল সঙ্গীত
ক'রোনা কুসুমদামে কবর ভূষিত।"*

যাঁহারা লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধির উত্তর দিকে বেগম নূরজাহানের সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার গোরস্থানের দৈন্য দেখিয়া একবিন্দু অশ্রু-বারি বর্ষণ করিবেন সন্দেহ নাই।

নূরজাহানের অন্তিম ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে। জাহাঙ্গীরের চাক্‌চিক্যময় সমাধি মন্দিরের অনতিদূরে নূরজাহানের সমাধিক্ষেত্রের দৈন্য দেখিয়া সত্যই দুঃখ হয়।

* অনেকে মনে করেন কবিতাটি কবরগাত্রে খোদিত আছে। আমি যখন লাহোর ভ্রমণ করিয়া নূরজাহানের কবরের গায়ে কবিতাটি খোঁজ করি তখন উহা দেখিতে পাই নাই।

মমতাজ মহল

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পর আর একজন অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী মোগল-সম্রাজ্ঞী হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানের কন্যা আরজুমন্দবানু। ইনিই ইতিহাস প্রসিদ্ধ তাজমহলের অধিষ্ঠাত্রী বেগম মমতাজ মহল। সম্রাট শাহ্‌জাহান ইঁহাকে বিবাহ করেন। মমতাজ যেমন অসামান্য রূপবতী তেমনই অসাধারণ গুণ-সম্পন্না রমণী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি দিক্‌-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নূরজাহানের ন্যায় মমতাজও তাঁহার স্বামীকে বশীভূত করিয়া রাজদরবারে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মানুরাগিনী রমণী ছিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া যখন শাহ্‌-জাহান দীর্ঘ আট বৎসর গৃহহারা হইয়াছিলেন তখন মমতাজ তাঁহার সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়া তাঁহাকে বিপদে আপদে সান্ত্বনা দিতেন। শাহ্‌জাহান সম্রাট হইয়া তাঁহাকে 'মালিক্ক-ই-জামান' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজকীয় সীলমোহর তাঁহার রক্ষণাধীনেই থাকিত।

বেগম মমতাজ অতি দয়াশীলা রমণী ছিলেন। তিনি বিধবা ও অনাথাদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন। কোন দুঃখী তাঁহার কৃপা হইতে কোন দিন বঞ্চিত হয় নাই। তিনি বহু দরিদ্র ও অনাথা বালিকার বিবাহের সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। অন্তঃপুরের অন্যান্য মহিলারা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। মমতাজ অতি মাত্রায় ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়িতেন এবং রোজা রাখিতেন। মুস্‌লিম ঐতিহাসিকগণ তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। স্বীয় চরিত্র মাহাত্ম্যে তিনি প্রজাগণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। মমতাজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে শাহ্‌জাহানের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি বলিতেন, "Empire has no sweetness, life itself has no relish left for me now."—রাজ্য শাসনে শান্তি নাই এবং জীবনের মাধুর্য্য ফুরাইয়া গিয়াছে।

এই পতিপরায়ণা বিদুষী মহিলা পারস্য ভাষায় বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সুকবিও ছিলেন এবং ফার্সি ভাষায় অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

জাহান-আরা

মোগল বিদুষীদের মধ্যে জাহান-আরার স্থান অতি উচ্চে। জাহান-আরা সম্রাট শাহ্‌জাহানের প্রথমা কন্যা এবং স্বনামধন্যা মমতাজ মহল তাঁহার জননী। মোগল দরবারে তিনি বেগম সাহেবা নামে সুপরিচিত। অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য তাঁহার নামাকরণ হইয়াছিল 'জাহান-আরা' বা জগতের অলঙ্কার। শৈশবে জাহান-আরার শিক্ষার বিশেষ সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। সিত্তী-উন্নিসা নামক জনৈকা সদ্বংশজাতা উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে মমতাজ মহল কন্যার শিক্ষাবিধানের জন্য নিযুক্ত করেন। শিক্ষয়িত্রীর চেষ্টায় জাহান-আরা শীঘ্রই পবিত্র কোর্‌-আন্‌ পাঠ করিতে শিক্ষা করেন।

জাহান-আরা ফার্সি ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর ছিল। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। জাহান-আরার বাল্যাবস্থায় নূরজাহানও জীবিত ছিলেন। আদর্শ মাতা এবং মাতার পিতৃস্বসার আদরে ও যত্নে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। অল্পকাল মধ্যেই তিনি একজন সুশিক্ষিতা মহিলা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইনি আজীবন অবিবাহিতা অবস্থায় কাটাইয়া

দেন। ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় ছিল। তিনি সুফীতত্ত্বের গ্রন্থরাজি গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন এবং সে বিষয় আলোচনা করিতেন এবং পবিত্র কোর্-আন্ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। জাহান আরা একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি কোর্-আন্ হইতে বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন। জাহান-আরা অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'মুনিস-উল-আরওয়া' নামক গ্রন্থখানি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। জাহান-আরার দুইখানি ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে আউলিয়া-কুল-শ্রেষ্ঠ খাজা ময়েনউদ্দীন চিশ্‌তী ও তাঁহার কতিপয় শিষ্যের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, মার্জ্জিত রুচি এবং মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব এবং গবেষণার বহু নিদর্শন আছে।

জাহান-আরা উদারতা ও দানশীলতার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মস্‌জিদ নির্ম্মাণ ও সরাইখানা প্রভৃতি স্থাপনের জন্য তিনি অকাতরে দান করিতেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সম্রাট শাহ্‌জাহান

আগ্রা দুর্গের পশ্চিম দিকের সুপ্রসিদ্ধ জুম্মা মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। দিল্লী নগরে সম্ভ্রান্ত লোকের অবস্থানের জন্য তিনি একটী মনোরম সরাইখানার প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহা পরিচালনার সুব্যবস্থা করেন। অধুনা দিল্লী ইন্‌ষ্টিটিউট ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির উপর এই সরাইখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

জাহান-আরা নিজে সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতিও ছিল অসাধারণ। তিনি আগ্রা, দিল্লী, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে বহু নয়নাভিরাম উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের উদ্যানটী বর্ত্তমানে 'আচবল' নামে প্রসিদ্ধ। দিল্লীর চাঁদনীচকের নিকটবর্ত্তী উদ্যানটী 'বেগমবাগ' নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমানে এই উদ্যানটির নাম হইয়াছে 'কুইন্স গার্ডেন'। এই উদ্যানের শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি, প্রমোদভবন, পয়ঃপ্রণালী ও ঝরণা সকল অতীব সুন্দর এবং নয়নতৃপ্তিকর।

আগ্রা দুর্গের কয়েকটী কক্ষ জাহান-আরার জন্য সংরক্ষিত ছিল। উহার অপরূপ কারুকার্য্য দেখিলে জাহান-আরার সৌন্দর্য্যবোধের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। এই সমস্ত কক্ষের দেওয়ালের তাক্‌গুলিতে তাঁহার গ্রন্থরাজি পরিপাটীরূপে সজ্জিত থাকিত।

অপূর্ব্ব পিতৃভক্তির জন্য জাহান-আরার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। শাহ্‌জাহানের বন্দী অবস্থায় আগ্রার নির্জ্জন দুর্গে তিনি বৃদ্ধ পিতার সান্ত্বনাদায়িনী মাতা ও সেবাপরায়ণা দুহিতার ন্যায় ছিলেন। চিরকুমারী মোগল-দুহিতা সর্ব্বপ্রকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বন্দী পিতার আমরণ সেবা করিয়া ধন্যা হইয়া গিয়াছেন।

জাহান-আরা নিজে ধার্ম্মিক ছিলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অন্তিম শয্যায় বলিয়া যান যে বিখ্যাত তাপস শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধি-পার্শ্বে যেন তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। আজিও পর্য্যটকগণ আউলিয়া সাহেবের দরগা'র পার্শ্বে জাহান-আরার সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া থাকেন। জাহান-আরার কবরগাত্রে শ্বেত প্রস্তরের উপরে যে কথাগুলি খোদিত আছে তাহার অনুবাদ এইরূপ :

—"তিনি জীবন্ত আত্মসত্ত" —কোর্-আন্।

—(হু-আল হাইউল কাইয়ূম)।

"আমার সমাধি তৃণ ভিন্ন কোন বহুমূল্য আবরণে আবৃত করিও না। দীন আত্মাদিগের পক্ষে এই তৃণই

যথেষ্ট সমাধি আবরণ। শাহ্‌জাহান দুহিতা চিশ্‌তী বোজর্গদিগের শিষ্যা, বিনশ্বর ফকীর জাহান-আরা, ১০৯২ হিজরী।"

সিত্তী-উন্নিসা

সিত্তী-উন্নিসা জাহান-আরার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই আদর্শ ও মহীয়সী মহিলা অশেষ গুণবতী ছিলেন। তাঁহারই যত্ন এবং সুশিক্ষা জাহান-আরার সদ্‌গুণরাজি বিকশিত করিয়াছিল। সিত্তী-উন্নিসা ইরাণের জনৈক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। পারস্য হইতে যে সমস্ত কর্ম্মবীর ও দানশীলা রমণী ভারতবর্ষে আসিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন, সিত্তী-উন্নিসা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশের প্রায় সকলেই বিদ্বান এবং চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। সিত্তী-উন্নিসার ভ্রাতা জাহাঙ্গীরের দরবারে রাজকবি ছিলেন। তাঁহার স্বামী নসীরা বিখ্যাত চিকিৎসক রুকনাই কাশীর ভ্রাতা। স্বামীর মৃত্যুর পর এই মহিলা সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যে চরিত্রের পবিত্রতা, কর্ম্মনৈপুণ্য ও মিষ্টভাষিতা গুণে তিনি সম্রাজ্ঞীর অনুগ্রহ লাভ

করেন। মোগল সম্রাজ্ঞী সিত্তী-উ'ন্নিসাকে স্বীয় সীল মোহর রক্ষার ভার দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

সিত্তী-উন্নিসা একজন সুপণ্ডিত রমণী ছিলেন। তিনি সুমধুর কণ্ঠে কোর্-আন্ আবৃত্তি করিতেন। ফার্সি ভাষায় গদ্য ও পদ্য লেখায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন। মোগল দরবারের এই উজ্জ্বল রত্নটীর সুখ্যাতি রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সৌরভের ন্যায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

জাহান-বানু

সম্রাট শাহ্ জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শেকোর কন্যা জাহান-বানু মোগল অন্তঃপুরের অন্যতম খ্যাতনাম্নী বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁহার প্রচলিত নাম ছিল জানী বেগম। জাহান-আরা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিতেন। অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য জাহান-বানু বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ আজমের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জাহান-আরার অভিভাবকত্বে জানী বেগম আদর্শ মহিলা-রূপে পরিগণিত হন। ইনি শুধু সুশিক্ষিতা এবং সুরুচিসম্পন্না মহিলা ছিলেন না, ইঁহার সাহস ও শৌর্য্যের কথা ইতিহাস-পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন।

১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার যখন বিজাপুর দুর্গ অবরোধ করিবার উদ্যোগ করেন সেই সময় সৈন্যগণ খাদ্যাভাবে হতাশ হইয়া পড়ে। কেহই যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছে না দেখিয়া জানী বেগম হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া তীর ধনুক হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। এই তেজস্বিনী মহিলার অসীম সাহস দেখিয়া সৈন্যগণ হৃতবল ফিরিয়া পাইল এবং তাহারা বীর বিক্রমে যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িল। এই মহিলার উৎসাহ না পাইলে কুমারের বিজাপুর অভিযান সম্ভবতঃ ব্যর্থ হইয়া যাইত।

জেব-উন্নিসা

জেব-উন্নিসা সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রথমা কন্যা। একজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা বলিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। শৈশবকালে হাফিজা মরিয়ম নাম্নী জনৈক বিদুষী মহিলার নিকট জেব-উন্নিসা শিক্ষা লাভ করেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। অসাধারণ ধীশক্তি বলে তিনি অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র কোর্‌-আন্‌ কণ্ঠস্থ করেন। জেব-উন্নিসা এক দিন পিতার নিকট সমগ্র গ্রন্থখানি আবৃত্তি করিয়া সভাসদ্‌গণকে মোহিত করেন। কন্যার অনন্যসাধারণ

স্মরণশক্তি দেখিয়া সম্রাট মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে ত্রিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করেন। আরবী এবং ফার্সি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেক সময় তিনি পিতার সহিত ধর্ম্মালোচনায় কালাতিপাত করিতেন।

সম্রাটের আদরিণী কন্যা হইয়াও জেব-উন্নিসা জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চ্চা জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। স্বীয় পুস্তকাগারে সংগৃহীত অসংখ্য ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থরাজি তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা ও পবিত্র জীবন যাপনের পরিচয় প্রদান করে। তিনি নিজে একজন সাহিত্যিক ছিলেন এবং কবি ও সাহিত্যিকদিগকে জ্ঞান চর্চ্চার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। বহু দরিদ্র লেখক তাঁহার অর্থানুকূল্যে সাহিত্য সেবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অগণিত অর্থব্যয়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সমূহের নকল করাইয়া লইতেন এবং পুস্তক প্রণেতাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতেন। সাহিত্য চর্চ্চার জন্য তিনি মোল্লা সফিউদ্দীনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি জেব-উন্নিসার অর্থে কাশ্মীরে আরামে বাস করিয়া সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। জেব-উন্নিসার সাহায্যে তিনি পবিত্র কোর্-আনের ফার্সি অনুবাদ করেন। এই অমূল্য

গ্রন্থখানি 'জেব-উত-তফসীর' নামে খ্যাত। জেব-উন্নিসা আওরঙ্গজেব রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফতোয়া আলমগীর'এর ফার্সি অনুবাদ করিয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেব কাব্য ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন না। তিনি রাজ্যমধ্যে ইতিহাস লেখা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাটের ভয়ে মোহাম্মদ হাসিম গোপনে ইতিহাস লিখিতেন বলিয়া তাঁহার নাম কাফি খান (গুপ্ত লেখক) বলিয়া প্রসিদ্ধ। সম্রাট আওরঙ্গজেব তবুও কন্যা জেব-উন্নিসাকে সাহিত্যচর্চ্চায় উৎসাহ দিতেন। এই সুশিক্ষিতা মহিলা তৎকালে রাজদরবারে আরবী ও ফার্সি সাহিত্যকে জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 'দিউয়ান-ই-মাখফী'তে তাঁহার অনেক কবিতা স্থান পাইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই দিউয়ানের সমস্ত কবিতাই জেব-উন্নিসার রচিত। অনেকে মনে করেন নিম্নের বিখ্যাত ফার্সি কবিতাটী তাঁহারই রচনা।

"হেজাবে নওরুসা দরবারে শওহর নামি মানদ
আগার মানদ শবে মানদ শবেদিগর নমি মানদ।"

অর্থাৎ নব বিবাহিতা তরুণীর লজ্জা তাহার স্বামীর নিকট থাকে না। যদি বা থাকে তবে তাহা মাত্র প্রথম রাত্রির জন্য। দ্বিতীয় রাত্রিতে উহা একেবারেই

বিলীন হইয়া যায়। সমস্ত কবিতাই জেব-উন্নিসার রচিত। অনেকে মনে করেন নিম্নের বিখ্যাত ফার্সি কবিতাটী তাঁহারই রচনা :

"হেজাবে নওরুসা দরবারে শওহর নমি মানদ
আগার মানদ শবে মানদ শবে দিগর নমি মানদ।"

অর্থাৎ—নব বিবাহিতা তরুণীর লজ্জা তাহার স্বামীর নিকট থাকে না, যদি বা থাকে তবে তাহা মাত্র প্রথম রাত্রির জন্য। দ্বিতীয় রাত্রিতে উহা একেবারেই বিলীন হইয়া যায়। রাজ-অন্তঃপুরের বিলাস সাগরের মধ্যে থাকিয়াও জেব-উন্নিসার হৃদয়কুসুম যে এইরূপ ভাবে বিকশিত হইতে পারিয়াছিল তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। দেশ বিদেশে তাঁহার যশঃ-সৌরভ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

জেব-উন্নিসা ভ্রাতা আকবরকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। আকবরও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে অপরিসাম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আকবর ভগ্নীর আদেশ ও উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন। ভগ্নীর আদেশ ও উপদেশ তিনি ভক্তিভরে প্রতিপালন করিতেন। জেব-উন্নিসার স্বর্গীয় গুণাবলীর জন্যই আকবর তাঁহাকে এইরূপ স্নেহ করিতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। আকবর যখন পিতার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, তখন জেব-উন্নিসা ভ্রাতাকে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব এই বিষয় জ্ঞাত হইলে তিনি কন্যাকে বিদ্রোহী পুত্রের সাহায্য-কারী বলিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। সম্রাট জেব-উন্নিসার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। তদবধি জেব-উন্নিসা দিল্লীর নিকটবর্ত্তী সলিমগড় দুর্গে আমরণ বন্দী অবস্থায় কালাতিপাত করেন।

বন্দী অবস্থায় জেব-উন্নিসাকে কঠোর ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। সেই সময় তাঁহার বেদনা-ভরা হৃদয়ে কতই না ভাবের উদয় হইত—তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ সময় তিনি খেদ করিয়া অনেক কবিতাও সম্ভবতঃ লিখিয়া গিয়াছেন। বন্দীশালাতেই জেব-উন্নিসার শেষ নিশ্বাস বহির্গত হয়। প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যু সংবাদে আওরঙ্গজেব বিশেষভাবে ব্যথিত হন।

বদরুন্নিসা

সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয়া কন্যা বদরুন্নিসা মোগল যুগের আর একজন সুশিক্ষিতা মহিলা। ভগ্নী জেব-উন্নিসার ন্যায় সুপণ্ডিত না হইলেও তিনি আরবী ও ফার্সি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। পবিত্র

কোর্-আন্ তাঁহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল। বদরুন্নিসা একজন সুরুচিসম্পন্না মহিলা ছিলেন।

নুরন্নিসা

মোগল গৌরব-রবি অস্তগমন-কালে আর একজন বিদুষী মহিলার আবির্ভাব হয়। তিনি প্রথম বাহাদুর-শাহের সহধর্ম্মিণী নুরন্নিসা। মোগল সাম্রাজ্যের গোধূলি লগ্নে এই উজ্জ্বল-রত্ন সন্ধ্যা তারকার ন্যায় মোগল রাজ-অন্তঃপুর আলোকিত করিয়াছিল। নুরন্নিসা মীর্জ্জা নাজমস্-সানীর কন্যা। কাফি খাঁন্ বলেন যে তিনি সুন্দর হিন্দী কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

মূর সভ্যতায় নারীর দান

অন্যূন সাত শতাব্দীর মধ্যে স্পেনে মূরগণের উত্থান ও পতন সংঘটিত হয়। ওমাইয়া খলিফা প্রথম ওলিদের সময় মুসলমানেরা স্পেন জয় করেন। আইবেরীয়ান উপদ্বীপের এই দেশটী মুস্‌লিম আক্রমণের সময় খৃষ্টান রাজার অধীনে ছিল। রাজার অত্যাচারে রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দের দুঃখের অবধি ছিল না। চির-নিগৃহীত ইহুদীগণের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছিল। তখন রাজা, উচ্চশ্রেণীর লোক এবং যাজক সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের একচেটিয়া প্রভুত্ব দেশের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিল। দাসত্ব প্রথার যথেষ্ট অপ-ব্যবহার হইত। ক্রীতদাস দাসীদিগকে পশুর চেয়েও হেয় মনে করা হইত। মনিবেরা একে অন্যের ক্রীতদাসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধাইয়া আমোদ প্রমোদ করিত। ক্রীতদাসদাসীগণ কোন সম্পত্তি স্বনামে বা বেনামে রাখিতে পারিত না। প্রভুর ইচ্ছামত তাহাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হইত। কৃষক শ্রেণীর অবস্থাও প্রায় ক্রীতদাসের ন্যায় শোচনীয় ছিল। বড় লোকেরা গরীব চাষীর রক্ত শুষিয়া ফাঁপিয়া উঠিত।

স্পেনের ঘোর দুর্দ্দিনে ইফ্রিকার শাসনকর্ত্তা মুসা বিন নাসীর সেনাপতি তারেককে এই দেশ জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। ফলে-ফুলে সুশোভিত স্পেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা মুসলমানদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুসলমানগণ যে সভ্যতার আলোক স্পেন দেশে বিস্তার করিয়াছিলেন তাহারই নাম মূর সভ্যতা—কেন না মূর দেশের (মরক্কোর) মুসলমানগণই প্রধানতঃ এই সভ্যতা বিস্তারে অগ্রণী ছিলেন।

সেনাপতি তারেক সৈন্য সহ যে একটী ছোট পাহাড়ের নিকট অবতীর্ণ হইলেন তাহার নাম হইল জিবালে তারেক (জিবাল অর্থ—পাহাড়) অর্থাৎ তারেকের পাহাড়। বর্ত্তমানে ঐ নামের অপভ্রংশ জিব্রাল্‌টার বলা হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে স্পেন বিজয় আরম্ভ হইয়া পীরেনীজ পর্ব্বত ও ফ্রান্সের লঙ্গেডক্ প্রদেশ পর্য্যন্ত স্থান-সমূহ মুস্‌লিম অধিকারে আসে। ইস্‌লামের সাম্যবাদ ও মহান্ নীতিসমূহ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের খৃষ্টান ও ইহুদীগণ দলে দলে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করেন।

ওমাইয়া খলিফাদের প্রতিনিধিগণ স্পেনে যে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার তুলনা জগতে বিরল।

গ্রানাডা ও কর্ডোভার গৌরব কাহিনী স্বপ্নবৎ মনে হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা মুস্‌লিম স্পেনে স্ত্রীজাতির স্থান এবং সভ্যতায় তাঁহাদের দান সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ইস্‌লামে নারীর স্থান সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থের অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। মহানবী মোহাম্মদের বাণীর অনুসরণ করিয়া আরবগণ তাহাদের নারীদিগকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা দিতেন। খলিফা ও শাসন-কর্ত্তৃগণ এদিক দিয়া অগ্রগণ্য ছিলেন। রাজকীয় অর্থ হইতে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল। মূরগণ নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। যেই যুগে সমগ্র ইউরোপ অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় সমাচ্ছন্ন, সেই যুগে মূরগণ স্পেনে এক অভিনব সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন।

স্পেনের মহিলারা সুরুচিসম্পন্না ছিলেন। মূরগণ অত্যন্ত পুষ্প-প্রিয় ছিল। শাহ্‌জাদী হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত সকলেই কেশ প্রসাধনে ফুল ব্যবহার করিত। প্রত্যেক প্রকার ফুলের এক একটী বিশেষ অর্থ ছিল এবং সেই ফুলের সাহায্যে কথাবার্ত্তা না

বলিয়াও নারীরা মনের কোমল ভাব প্রকাশ করিতে পারিত।

স্পেনের নারীগণ সর্ব্বদা সুপরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিত। তাহারা দৈনিক কয়েকবার করিয়া স্নান করিত। দেশের অসংখ্য স্নানাগারে বসিয়া তাহাদের খোশ গল্প চলিত এবং দাসদাসীদিগকে সঙ্গে করিয়া আমোদ প্রমোদ করিত। স্নানাগারে গানের আসর বসাইয়াও অনেক সময় নারীরা তাহাদের চিত্তবিনোদন করিত।

যে যুগে স্পেনে মূর-সভ্যতা বিস্তার লাভ করে, সে যুগে ইউরোপের অন্যান্য দেশের নারীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সুসভ্য গ্রীস ও রোমে নারীদের স্থান ছিল অতি নিম্ন স্তরে। সেই সমস্ত দেশে নারীগণকে কদর্য্যতার ভিতর বাঁচিয়া থাকিতে হইত। এথেন্সের গৌরবময় উজ্জ্বল যুগের ইতিহাসে সুশিক্ষিতা ও প্রতিভাসম্পন্না নারীর উল্লেখ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য এবং ঐ সমস্ত নারীরা চরিত্রহীনাও ছিল। স্বয়ং পেরিক্লিস্ স্বীয় বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাহাকে লইয়া বসবাস করিতেন, সেও একজন ভদ্র-বেশ্যা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রোট

বলেন যে স্পার্টার বাহিরে সমগ্র গ্রীসদেশে একমাত্র থিওডোটে ও পেরিক্লিস্‌-প্রণয়িনী আস্পাসিয়া ব্যতীত আর কোন রমণীরই কোন মানসিক ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া জানা যায় না। বিবাহিতা ও অবিবাহিতা নারীকে কঠোর অবরোধের মধ্যে জীবন যাপন করিতে হইত। সমাজের কুব্যবস্থার দরুণ নারী চরিত্রে কোন প্রকার মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হইত না।

শার্লিমেন সে যুগের সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য খৃষ্টান নরপতি হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। আরব সভ্যতার প্রভাবেই তাঁহার দরবারে জ্ঞান-চর্চ্চা হইত। একদা তিনি সভাসদ্‌বর্গের সম্মুখে স্বীয় ভগিনীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। প্রথম দিকে জয় পরাজয় অনিশ্চিত থাকে; শেষকালে সম্রাট তাঁহার ইস্পাতনির্ম্মিত দস্তানার দ্বারা ভগিনীর কয়েকটী দাঁত ভাঙ্গিয়া বিজয়ী হন। খৃষ্টান জগতে উচ্চশ্রেণীর মহিলারা যদি এইরূপ ব্যবহার পাইতেন, তবে সাধারণ ঘরের নারীদের অবস্থা যে কিরূপ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়!

বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত এই অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। দ্বিতীয় চার্লসের সময় অশিক্ষায় দেশ পূর্ণ ছিল। নিজের নাম সহি করিতে পারে এইরূপ নারী প্রায়ই

খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এমন কি রাজ-কন্যারাও শুদ্ধরূপে লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংল্যাণ্ডের স্বামীরা স্ত্রীকে চাবুক মারিত। সেখানকার আইনে রমণীরা পুরুষের হস্তে বর্ব্বরোচিত ব্যবহার পাইত।

ইংল্যাণ্ডের নারীদের যখন এইরূপ দুরবস্থা, তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মূর রমণীরা সমস্ত শিল্পকলায় দক্ষতা লাভ করিয়া সুবিখ্যাত হন। স্পেনের নারীরা বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শিল্পকার্য্যে মূর নারীর স্থান তদানীন্তন ইউরোপ হইতে অনেক উচ্চে ছিল। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া বক্তৃতা শুনিতেন এবং প্রকাশ্য সভায়ও বক্তৃতা দিতেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রত্যেকটী বিভাগে তাঁহাদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী পুরাণে তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহারা কবিতা লিখিতেন ও সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন এবং জ্ঞান-রাজ্যে তাঁহারা পুরুষদের সহিত সমানভাবে প্রতিযোগিতা করিতেন। দর্শন, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য তাঁহারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কোন কোন রমণী খলিফার উপদেষ্টা ও সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

স্পেনের মহিলারা প্রায়ই উচ্চশিক্ষিতা হইতেন। সর্ব্বশ্রেণীর পুরুষেরা তাঁহাদের সহিত শৌর্য্যপূর্ণ ব্যবহার করিত। ওমাইয়া খলিফাগণের আমলে নারীজাতির মানসিক বৃত্তির প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিজ্ঞান ও সাহিত্য ক্ষেত্রের সর্ব্বদিক তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। নারীরা সর্ব্বত্র বিপুল সম্মান পাইতেন। কখনও কেহ প্রকাশ্যে নারীদের অপমান করিত না। স্বামীর অত্যাচার হইতে আইন তাহাদিগকে রক্ষা করিত। বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহারা ভরণ-পোষণ পাইত। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য স্ত্রীকে কাজ করিতে দিলে স্পেনের লোকেরা তাহার নিন্দা করিত।

প্রতি বৎসর স্পেনের রাজধানীতে একটী নির্দ্দিষ্ট ময়দানে ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ হইত। নারীরা এই সমস্ত আমোদ প্রমোদে অবাধভাবে যোগদান করিতেন। "হেরেমের পরমা সুন্দরী মহিলারা অনাবৃত বদনে সেখানে বসিয়া মৃদুহাস্যে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহাদের রেশমী পরিচ্ছদে রামধনুর সমস্ত বর্ণের ডোরা থাকিত; তাঁহাদের স্বর্ণের কঙ্কণ, কোমরবন্ধ ও মণিমুক্তার হার সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিত; ইহার সহিত তাঁহাদের অনুপম মোহিনী শক্তি মিলিত হইয়া যেরূপ জাঁকাল

ও মনোমোহকর দৃশ্যের সৃষ্টি করিত, প্রাচীন বা মধ্যযুগে তাহার তুলনা মিলিত না।”

রাজনীতি ও সামাজিক কার্য্যকলাপে স্পেনের নারীরা অবাধে অংশ গ্রহণ করিতেন। লাবনা নাম্নী একজন মহিলা খলিফা হাকামের সেক্রেটারীরূপে কার্য্য করিতেন। তিনি ব্যাকরণ ও অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্না ছিলেন। তাঁহার রচনা শক্তি অদ্ভুত ছিল। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া খলিফা হাকামের ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তিও বিস্মিত হইয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্র লইয়া তিনি গভীরভাবে নিমগ্ন থাকিতেন রাজধানী কর্ডোভা নগরেই এই মহীয়সী মহিলার আবাসভূমি ছিল।

স্পেনের নারীরা হস্তলিপির জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে যেমন ছাপাখানার প্রচলন হইয়াছে সে যুগে তেমন কিছুই ছিল না। সমস্ত গ্রন্থই হস্তলিখিত ছিল। সেজন্য সুন্দর হস্তাক্ষরের বিশেষ আদর ছিল। ফাতিমা নাম্নী জনৈক মহিলা সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মনোরম হস্তাক্ষরের জন্য মহিলারা গৌরববোধ করিতেন এবং সুধীজন কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেন।

কর্ডোভার যুবরাজ আহাম্মদের কন্যা আয়েশা একজন

বিদুষী রমণী ছিলেন। তিনি সুকবিও ছিলেন। সুলেখিকা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশের চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কর্ডোভার রয়াল একাডেমীতে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা করিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাঁহার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

কাফ্‌ফা নাম্নী জনৈক মহিলা বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গীতেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া যাইত।

সেভিলের ইয়াকুব আল আনসারীর কন্যা মরিয়ম সে যুগের আর একজন খ্যাতনাম্নী মহিলা। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক ছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্র, কবিতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন। বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের কুমারীদের বিদ্যাশিক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতা ও দয়াশীলতায় মুগ্ধ হইয়া বহু নারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেকালে আর একজন মহিলা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার নাম শোহ্‌দাল কবিরা। তিনি

ঐতিহ্য ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুন্দর বক্তৃতা দিতেন। খলিফা হাকামের সহধর্ম্মিণী রাজিয়া বেগম একজন বিদুষী রমণী ছিলেন। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া খলিফা তাঁহাকে 'সৌভাগ্য-সেতারা' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের আজ-জহ্‌রা নাম্নী এক অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী ছিলেন। খলিফা তাঁহার প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত ছিলেন। আজ-জহ্‌রা শব্দের অর্থ সুন্দরী। বেগম একদা স্বামীর নিকট আবদার করিয়া বসেন যে তাঁহার নামে একটা নগর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে হইবে। বেগমের অনুরোধে খলিফা কর্ডোভার অনতিদূরে 'বধূঁর পাহাড়' নামক পর্ব্বতের পাদদেশে অবিলম্বে নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ অর্থ এই কার্য্যে ব্যয়িত হইত। এই কার্য্যে প্রত্যহ দশ হাজার শিল্পী ও শ্রমিক কার্য্য করিত এবং নগর নির্ম্মাণের জন্য দৈনিক ছয় হাজার প্রস্তরখণ্ড কাটা ও মাজা হইত। মাল-মশলা আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদা তিন সহস্র ভারবাহী পশু নিযুক্ত থাকিত। এই নবনির্ম্মিত নগরেই খলিফা জহ্‌রা প্রাসাদের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। এই বিরাটকায়

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় একুশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

জহ্‌রা প্রাসাদের সংলগ্ন বাগানে বন্য পশু ও নানা দেশের নানাপ্রকার পক্ষীর অপূর্ব্ব সমাবেশ ছিল। মধ্য তোরণের উপর বেগম জহ্‌রার এক মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদালানে যে সমস্ত ফোয়ারা ছিল তাহাতে স্বর্ণ-নির্ম্মিত ও প্রস্তরখচিত মূর্ত্তি সমূহের মুখবিবর হইতে বারিধারা নিঃসৃত হইত। জহ্‌রা প্রাসাদে পুরুষ-চাকরের সংখ্যাই ছিল তের হাজার সাত শত পঞ্চাশ; উহার পুষ্করিণীতে মাছের জন্য রোজ বার হাজার রুটী দেওয়া হইত। বিভিন্ন শ্রেণীর পর্য্যটকগণ সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের পর্যাটন-কালে তাঁহারা জহ্‌রা প্রাসাদের সহিত তুলনার যোগ্য কোন কিছুই দেখিতে পান নাই। বেগম জহ্‌রার এই অতুলনীয় কীর্ত্তি তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে।

চিকিৎসা-বিদ্যায় মুস্‌লিম স্পেনের নারীরা অগ্রণীয়া ছিলেন। কর্ডোভার মহিলা চিকিৎসকগণ স্ত্রীরোগে (Gynecology) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সরকারী হাসপাতাল সমূহে স্ত্রী চিকিৎসকগণ দক্ষতার সহিত চিকিৎসা কার্য্য করিতেন।

প্রাচ্যে যেমন বাগ্‌দাদ নগরী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, স্পেনের গ্রানাডা সহরের খ্যাতিও তেমনি সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাগ্‌দাদ ও গ্রানাডার মুস্‌লিম কীর্ত্তিমালা জগতের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রানাডার মহিলারা বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চ্চায় তদানীন্তন ইউরোপের অর্দ্ধসভ্য রমণীদের অপেক্ষা অগ্রণী ছিলেন।

গ্রানাডার আবুবকর আলগাসানের কন্যা নাজ্‌হুন হিজরীর ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুকবি ছিলেন। ইতিহাস ও সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

গ্রানাডার অদূরবর্ত্তী ওয়াউদী নামক স্থানে জায়েদ নামে জনৈক পুস্তক বিক্রেতা বাস করিতেন। তাঁহার জয়নাব ও হাম্‌দা নাম্নী দুইটী গুণবতী কন্যা ছিলেন। ইবন্নুল আব্বাস তাঁহার 'তাহফাতুল কাদিম' নামক গ্রন্থে বলেন যে তাঁহারা উভয় ভগিনী সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুন্দরী, নম্র এবং সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। জ্ঞানানুসন্ধান লিপ্সায় তাঁহারা প্রায়শঃ পণ্ডিতদের সাহচর্য্যে আসিতেন এবং নিজেদের

আত্মসম্মান ও গৌরব বজায় রাখিয়াই পুরুষদিগের সহিত সমপর্য্যায়ে চলিতেন। পুরুষদের সহিত অবাধ মেলা-মেশার জন্য কেহ তাঁহাদিগকে কোন দোষারোপ করিতে পারে নাই।

হাফ্‌সা এবং আল কালাইয়া গ্রানাডার দুইজন খ্যাতনাম্নী বিদুষী মহিলা। সেভিলে সোফিয়া নাম্নী জনৈক মহিলা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সুকবি ও বাগ্মী ছিলেন। লিপি চাতুর্য্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁহার মনোরম হস্তাক্ষর সাধারণের বিস্ময় সৃষ্টি করিত। হস্তাক্ষরের উন্নতিকল্পে বহু লেখক তাঁহার হস্তাক্ষর নকল করিতেন। তাঁহার প্রতিভার কাহিনী দিক্-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আবু ইয়াকুব আল ফায়সালীর কন্যাকে 'আববের করিনা' বলা হইত। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করেন।

মোহাম্মদ আল-মুস্‌তাক্‌ফিবিল্লা'র কন্যা ওয়ালেদাহ্ একজন খ্যাতনাম্নী কবি ছিলেন। তদানীন্তন যুগের শ্রেষ্ঠ মহিলা বাগ্মী হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পাণ্ডিত্যে তিনি তাঁহার পিতার রাজদরবারের সভাকবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তখনকার ইতিহাসে এই যুবরাজ্ঞী

সম্বন্ধে অনেক গল্প স্থান লাভ করিয়াছিল। সৌন্দর্য্য, পদমর্য্যাদা, পবিত্রতা ও চারিত্র্য মাহাত্ম্যে তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিকে সৌরভের মত বিস্তারিত হইয়াছিল। তিনি বহু বৎসর জীবিত ছিলেন। কুমারী অবস্থায়ই তাঁহার গৌরবময় জীবনের অবসান ঘটে।

কবি আবুল হাসানের কন্যা হাসানা ও উম্মুলউলা নাম্নী দুই জন যশস্বী মহিলা উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে গণ্য হইতেন। আম্মাতুল-আজিজা আশ-শারিফা মহানবী মোহাম্মদের বংশধর। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিতা এবং ধার্ম্মিকা রমণী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

আল আরুজ্জিয়া নাম্নী জনৈক মহিলা ভ্যালেনসিয়া সহরে বাস করিতেন। ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। হাফ্সা আর-রুকুনিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য, প্রতিভা, পদমর্য্যাদা ও ধনসম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। হামদুনের কন্যা হাফ্সা চতুর্থ হিজরীর প্রসিদ্ধ কবি ও বিদুষী মহিলা। সেভিলের আস্‌মা আল আমাবিয়াহ্ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

কাজী আবু মোহাম্মদ আব্দুল হকের কন্যা উম্মুল হেনা একজন কবি ও আইনজ্ঞ ছিলেন। কর্ডোভা

নগরের বাহ্‌জা একজন খ্যাতনাম্নী কবি ও প্রসিদ্ধ ওয়ালেদার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। অপরূপ সৌন্দর্য্য ও কবিত্বশক্তির জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। সেভিলের শেষ রাজা মু'তামিদের কন্যা বুসনা পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।

কর্ডোভার পতনের পর গ্রানাডা আরামদায়ক আবাস-ভূমিতে পরিণত হয়। এই সময় গ্রানাডার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। খলিফাদের রাজধানীতে নারীরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিতেন। তাঁহারা পুরুষদের সহিত অবাধভাবে মেলামেশা করিতেন এবং সভাসমিতি ও সঙ্গীতের জলসায় উপস্থিত থাকিয়া গ্রানাডাবাসীগণকে আমোদ-প্রমোদে রাখিতেন। নারীদের অদম্য উৎসাহে গ্রানাডার বীরগণের প্রাণে বীরত্বের সঞ্চার করিত। আরব অশ্বারোহী ও তীরন্দাজগণ প্রণয়িনীদের নাম কোমরে বাঁধিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। নাইটগণ তাঁহাদের প্রণয়িনীর উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতেন এবং প্রায়ই তাঁহাদের সহিত নৃত্যগীতের জলসায় যোগদান করিতেন।

কথিত আছে যে মূর রমণীগণ সুন্দরী এবং অধিকাংশই

মধ্যকায় বিশিষ্ট দেহ এবং আলাপপ্রিয় ছিলেন। আলাপ আলোচনায় তাঁহারা বিশেষ দক্ষ ছিলেন। রেশমী ও সূতী কাপড়ের মনোরম বেশভূষা নারীদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিত। ঐতিহাসিক ইবনুল কাতির নারীদের মনোরম বেশভূষার বাড়াবাড়ির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নারীরা অতিরিক্ত পরিমাণে আতর ও গোলাব ব্যবহার করিতেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীরা চুণী পান্না, হীরা ও মুক্তা খচিত অলঙ্কারাদি দ্বারা নিজদিগকে সুসজ্জিত করিতেন। স্বর্ণ এবং মূল্যবান প্রস্তরের অলঙ্কারের সহিত এই সমস্ত অলঙ্কারের সংমিশ্রণ অতীব সুন্দর দেখাইত।

ফলকথা, স্পেনের নারীরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রণীয়া ছিলেন। যে বিরাট জাতির সভ্যতার অনুসরণ করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ ধন্য হইয়াছে, তাহাদের নারী জাতির দানও সেই সভ্যতার একটী অংশ। মাতা উপযুক্তা হইলে সন্তানও উপযুক্ত হয়। শিক্ষিতা নারীদের সন্তান কখনও মূর্খ হইতে পারে না। মুসলমান নারীরা নিজেদের সন্তানের বাল্যশিক্ষা নিজেরাই সমাপ্ত করিয়া দিতেন। সন্তানগণ যাহাতে ভবিষ্যতে দেশের ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ উপযুক্ত

করিয়া তোলাই ছিল মূর রমণীর উদ্দেশ্য। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পকলার প্রত্যেক শাখায় মূর নারীরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া নিজদিগকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতিকেও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

সমাপ্ত

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	১৪	উত্তাপ	উত্তাপজ্বাল
৩৯	১৫	কনের	করেন
৪২	১৮	ফতিমা	ফাতিমা
৪৬	১	ঐসেতের	ক্রুসেডের
৪৬	১	খালাহ্‌উদ্দীনের	সালাহ্‌উদ্দীনের
৪৭	৯	lovely	lively
৪৯	১১	কুখ্যাত হেজাজকে	কুখ্যাত হাজ্জাজকে
৫৫	৭	করিল	করিলেন
৬৭	১	নিটোল	নিচোল
৬৭	১৭	আফখান	আফসান
৯৫	৪	নাজহন	নাজহুন

মৌলভী এ. এফ, এম, আব্দুল জলাল, এম, এ, বি, এল
সাহেবের অন্যান্য বই—

তমুদ্দন সিরিজ

ইবনে খালদুন

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইবনে খালদুনকে সমাজ-বিজ্ঞানের জনক বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে তাঁহার বৈচিত্রময় জীবনী ও "মুস্‌লিম সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা স্থান পাইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইবনে খালদুনের দান, তাঁহার সমাজ-বিজ্ঞানের মতবাদ সমূহ, তৎকালীন স্পেন ও আফ্রিকার মুস্‌লিম রাজ্যগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং শাহী দরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের চমক্‌প্রদ বর্ণনা পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করুন। দাম মাত্র পাঁচসিকা

ইউরোপীয় সভ্যতায় ইস্‌লামের দান

ক্রুসেডের মর্ম্মন্তুদ্ কাহিনী এবং ইউরোপীয় সভ্যতার উপর মুস্‌লিম সভ্যতার প্রভাব, মুস্‌লিম স্পেন, গ্রানাডা ও কর্ডোভার গৌরবময় যুগের কীর্ত্তিকাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা ইউরোপের দর্শন ও বিজ্ঞান যে মুস্‌লিম দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাও ইহাতে দেখান হইয়াছে। আজই একখানা সংগ্রহ করুন।

দাম মাত্র পাঁচসিকা

গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী বই

(শীঘ্রই বাহির হইবে)

মহাত্মা ইমাম আল গাজ্জালী

মুস্‌লিম সংস্কৃতি ও—সভ্যতা প্রথম ভাগ

ঐ দ্বিতীয় ভাগ

ঐ তৃতীয় ভাগ

ঐ চতুর্থ ভাগ

আরব জাতির দিগ্বিজয়

আলাউদ্দীন খিলজী

আমার ভারত ভ্রমণ

প্রাপ্তিস্থান—

১। **গুলিস্তান লাইব্রেরী**—১০-২, মোল্লাপাড়া বাই লেন, শিবপুর (হাওড়া)

২। **ইতিকথা বুক ডিপো**—৩৫এ, মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩। **মোহাম্মদী বুক এজেন্সী**—৮৬এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

৪। **চৌধুরী ব্রাদার্স**—বাগের হাট, খুলনা

৫। **মডার্ণ বুক ডিপো**—খুলনা

ও

অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়